তরুণের স্বপ্ন

সুভাষচন্দ্র বসু

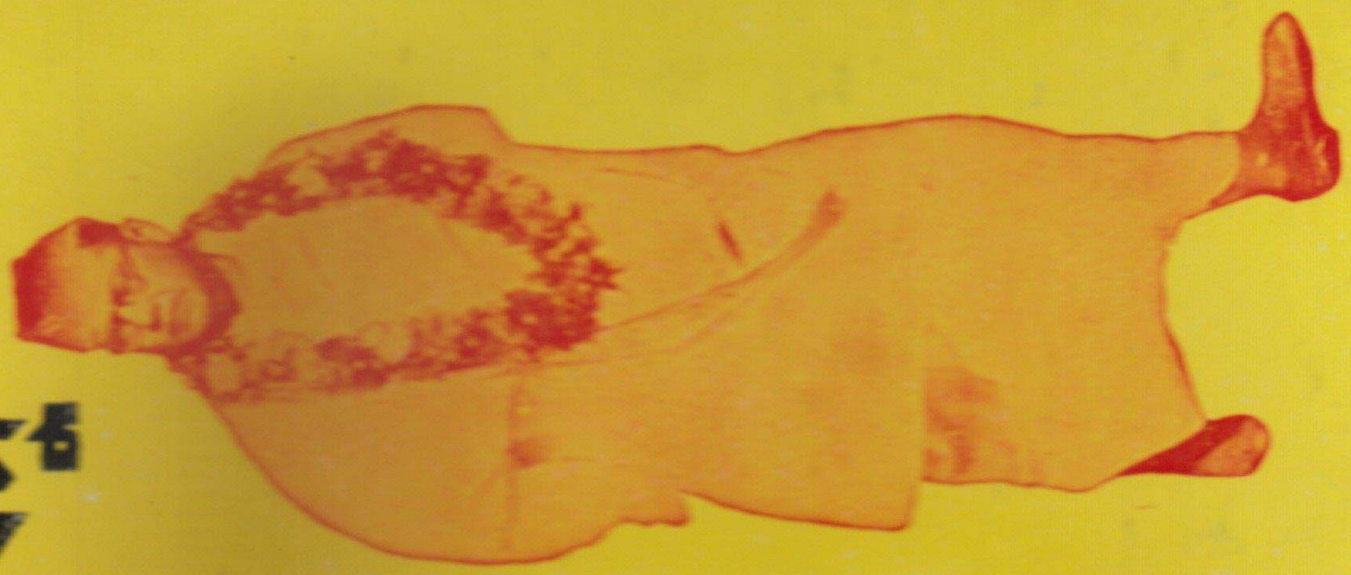

তরুণের স্বপ্ন

তরুণের স্বপ্ন

সুভাষচন্দ্র বসু

আনন্দ

প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬
দ্বাবিংশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ সুবোধ দাশগুপ্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-657-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

TARUNER SWAPNA
[Essays, Letters & Speeches]
by
Subhas Chandra Bose

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১২৫.০০

নিবেদন

গত ১৩৩০ সাল হইতে এখন পর্যন্ত আমার যে সকল পত্র ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা হেতু সকল পত্র ও প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ইতি—১০ই পৌষ, ১৩৩৫।

বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

১নং উডবার্ণ পার্ক
কলিকাতা

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে, সুভাষচন্দ্রের "তরুণের স্বপ্ন" প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পর প্রকাশিত হয় "নূতনের সন্ধান"।

ইহার পর বহু বৎসর অতীত হইল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন আজও সফল হয় নাই, শেষ হয় নাই নূতনের সন্ধান। বই দু'খানির যা 'গোড়ার কথা', তা সেদিন যেমন, আজও তেমনি সত্য আছে। স্বপ্নকে রূপায়িত করিতে হইলে যে ঐকান্তিকতা, আগ্রহ ও সাধনার প্রয়োজন, তা আজও আমরা অর্জন করিতে পারি নাই।

বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানী-গুণী বা বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার অভাব নাই। কিন্তু যে-মানুষ সকল জ্ঞানকে দীপ্তিমণ্ডিত করিবে, সকল চিন্তাকে ফলপ্রসূ করিবে, সকল প্রয়াসকে জয়মণ্ডিত করিবে, সে-পুরুষের অভাব এখনও মিটিল না।

বিবিধ প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও ভাষণের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র ঐ পৌরুষ লাভের পথনির্দেশ করিয়াছেন।

"তরুণের স্বপ্ন" ও "নূতনের সন্ধান" প্রকাশের পর সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যেন বই দু'খানির সংযুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে এবং সহযোগিতায় আজ সুভাষচন্দ্রের সেই ইচ্ছার পূরণ হইল; ইহাতে আমাদের সকলেরই আনন্দ।

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশের অগণিত আগ্রহী সন্তান নব নব কর্মোদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নকে সার্থক করিতে উদ্‌বুদ্ধ হউন—এই আশায় নেতাজীর শুভ জন্মদিনে তাঁর মর্মবাণী দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করিলাম। ইতি—

গোপাললাল সান্যাল

২৩/এ, জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড,
কলিকাতা ২০
২৩শে জানুয়ারী
১৯৬৭

তরুণের স্বপ্ন

প্রবন্ধ
আত্মনিবেদন ১
তরুণের স্বপ্ন ৮
দেশের ডাক ১১
গোড়ার কথা ১৪

পত্রাবলী
তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা ২০
সমাজ-সেবা ও কুটির-শিল্প ২৩
চরিত্র-গঠন ও মানসিক উন্নতি ৩০
জেল ও কয়েদী ৩৮
দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ৪৫
হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট ৪৯
কারামুক্তির প্রস্তাবের উত্তর ৫১
জীবনের লক্ষ্য ৫৭
উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিবৃন্দের নিকট নিবেদন ৬০
উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিগণের নিকট নিবেদন ৬২
দেশবন্ধু (১) ৬৫
দেশবন্ধু (২) ৬৯

নূতনের সন্ধান

ছাত্র-আন্দোলন
১ সুর্মা উপত্যকা ছাত্র-সম্মেলন ৮৫
২ হুগলী জেলা ছাত্র-সম্মেলন ৯৩
৩ পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মেলন ৯৯
৪ মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন ১০৭

যুব-আন্দোলন
১ পাবনা জেলা যুব-সম্মেলন ১১৪
২ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেলন ১২০
৩ মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলন ১২৪
৪ নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন ১৩৩
৫ মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলন ১৩৯

আত্মনিবেদন

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কালে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সে সময় তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া দেশসেবা করিবার সুযোগ লাভের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র দুখানি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

THE UNION SOCIETY,
CAMBRIDGE

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধহয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধহয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গবর্নমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টে barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাস করি এবং Honours -এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাস করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B.A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরি করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই।

আমি বাড়ীতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরি ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরি ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধহয় চাকুরি ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরি ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরেজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত।

লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy-টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকার লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা clear-cut plans লইয়া চাকুরি ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে, চাকুরি ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলাদেশে স্বদেশ সেবাযজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক্—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবর কাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ এ-পর্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া।

মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবাযজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I.C.S. probationer; আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি censored হয়! আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এইভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর—সুতরাং আশা করি যে, আমি যে-পর্যন্ত চাকুরি না ছাড়িতেছি সে-পর্যন্ত আপনি কাহাকেও এ-বিষয়ে কিছু বলিবেন না।

আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরেজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-Editorial staff-এ কাজ করিতে পারি। তাহা ছাড়া "জাতীয় কলেজের" নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research student থাকিবেন—যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই। তারপর Native States-দের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed classes-দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুন মাদ্রাজে আজ সব non-Brahminরা Pro-Government এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress-এর একটা permanent staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগৃহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (problem-এ) একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই। আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী Staff of research students চাই।

তাছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department খোলা দরকার। Intelligence Department-এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date খবর (facts &

figures) যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া propaganda department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এসব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও কিছু বোধ হয় করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি।

যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরি ত্যাগ করিব; অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন কারণ চাকুরি ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে, যদি চাকুরি ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

প্রণত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমার ঠিকানা—
Fitz William Hall
Cambridge.

THE UNION SOCIETY,
CAMBRIDGE
২রা মার্চ ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি চাকুরি ছাড়া সম্বন্ধে একরকম কৃত-সংকল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কিরকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন —সুতরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কিরকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কিরকম কর্মীলোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে,—

যে পর্যন্ত আমার চাকুরি ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন।

চাকুরি ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি, অবশ্য যদি সময় মত passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তাছাড়া দেশে গিয়া যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যতশীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial staff-এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেস' সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research-students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। 'কংগ্রেস' তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে 'কংগ্রেসের' একটি policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট

policy নাই। তারপর labour and factory legislation সম্বন্ধেও 'কংগ্রেসের' কোন বিশিষ্ট policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট policy নাই। তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে Congress-League scheme একেবারে পুরানো হইয়া গিয়াছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারি করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গতে ব্যস্ত, সুতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোনও সমস্যা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেকদিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেই দিন কোন বিষয়ে কোন policy-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয় ও ব্যয় (Revenue & Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে—তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি, তারপর সুবিধামত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি।

আমার পক্ষে চাকুরি ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা—সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশসেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গদেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকুরি ছাড়িলেই এখানে পাঁচ জনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচ জনের কাছে Self justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

তরুণের স্বপ্ন

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে —ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি। সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ;
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির

প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে—সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা, হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্তি

ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দেশের ডাক

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নরনারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কি উপায়ে এই কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্বপ্রধান সমস্যা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী অবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকেই বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকালই বাঙ্গালীই থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষ কেন—পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-

চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করেনি? এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত দুই তিন বৎসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসেছিল সে বন্যা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে, কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তার স্রোতে আবার প্রবল বন্যা আসবে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে।

এই নব জাগরণের স্বরূপ কি হবে তা' কে বলতে পারে? এই নব যজ্ঞের পুরোহিত কে হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় মগ্ন আছেন তা' কে বলতে পারে? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষী তাঁর আসনে বসবেন—তা' আমরা জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই নব জাগরণের জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরাই ত চিরকাল "জীবন-মৃত্যু"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে সেবা ও ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের

মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাগ্যদেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।

১১ই পৌষ. ১৩৩২

গোড়ার কথা

মানুষের জীবনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্ধক্য আছে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ ক্রমান্বয়ে এই সব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরে এবং মৃত্যুর পর নূতন কলেবর ধারণ করে—জাতিও মরে এবং মরণের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করে। তবে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সব জাতি মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠে না। যে জাতির অস্তিত্বের আর সার্থকতা নেই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে—সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায় অথবা কীটপতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অস্তিত্বের আর নিদর্শন থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি?

মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে মিশলেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও জাতির শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা; জাতির সৃষ্টিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন তখন তার কার্যতালিকা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করাই তার একমাত্র নীতি ব'লে পরিগণিত হয়। এ অবস্থায় পড়েও কোনও কোনও জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যখন জাতিকে এসে গ্রাস করে, তখন সে কোনও প্রকারে নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে, অন্য জাতির সঙ্গে মিশে ভূত হয়ে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; প্রসুপ্ত জাতি আবার চোখ খোলে; তার সৃষ্টি-শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদ্মের মত জাতির প্রাণধর্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে, নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ

লাভ করে। এরূপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা mission আছে,—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।

ভারতের এই mission-এ যার বিশ্বাস আছে—সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে। ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক যে বাঁচার মত বেঁচে আছে এ-কথা সত্য নহে। ভারতের এবং বাঙ্গলার তরুণদের এই বিশ্বাস আছে—তাই তারা বেঁচে আছে।

দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত—"কিসের জন্য, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি?" নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম এই: "ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সুখ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি। এই অটল, অচল বিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলার তরুণ শক্তি মৃত্যুঞ্জয়।"

এই "শ্রদ্ধা", এই আত্মবিশ্বাস যার আছে সেই ব্যক্তিই সৃষ্টিক্ষম, সেই ব্যক্তিই দেশ-সেবার অধিকারী। জগতে মহৎ প্রচেষ্টা যাহা কিছু আছে, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের আত্ম-বিশ্বাস ও সৃষ্টিশক্তির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। নিজের এবং জাতির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা-ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর একটা গুণ আছে যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার বলে সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙ্গালী বর্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য ক'রে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য তাহা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলা দেশে এত সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণে দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙ্গবে না। যে জাতির idealism (আদর্শ-প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা-ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, suffering-এর (দুঃখ) মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। suffering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে—তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই; সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের ভিতর একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে—তার কাছে suffering একটা গৌরবের জিনিষ, সে দুঃখ কষ্টের চাপে মুমূর্ষু না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে ওঠে। এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় এই—"আনন্দের উৎস কোথায়? ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় যে বিজলী চমকায়, তার উৎপত্তি কোথায়?" আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগ থেকে। যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুন দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ ব'লে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সে-ই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে

পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।

গত এপ্রিল মাসে ইনসিন জেলে একটি রুশীয় উপন্যাস পড়তে পড়তে ঠিক এই ভাবের প্রতিধ্বনি পেলাম। লেখক একজন নায়কের মুখ দিয়ে রুশ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ—

There is still much suffering in store for the people, much of their blood will yet flow, squeezed out by the hands of greed; but for all that, all my suffering, all my blood is a small price for that which is already stirring in my breast, in my mind, in the marrow of my bones! I am already rich, as a star is rich in golden rays. And I will bear all, will suffer all because there is within me a joy which no one, nothing can ever stifle! In this joy there is a world of strength!

[আমাদের কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে; লোভী ও অত্যাচারীদের নিষ্পেষণে আমাদের অনেক রক্ত এখনও বইবে। তথাপি যে সত্য আমার চিত্তে, হৃদয়ের অন্তরে ও অস্তিমজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, তা পাবার জন্য যদি আমাকে সকল দুঃখকষ্ট ভোগ ও আমার সমস্ত রক্ত দান করতে হয়, তাহ'লেও বুঝব যে, অতি অল্প মূল্যে এতবড় সম্পত্তি পেয়েছি! সোনার কিরণমণ্ডিত তারকার মত আমার আজ ঐশ্বর্য! তাই আমি সকল যন্ত্রণা ক্লেশ সহ্য করব, সব দুঃখকষ্ট আমার বুকের মধ্যে টেনে নেব, কারণ আমি অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি তাকে পার্থিব কোনও বস্তুই চেপে রাখতে পারে না! এই আনন্দই অনন্ত শক্তির আকর!]

নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখকষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হ'তে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধ।

কয়েকদিন পূর্বে আমার ছাত্রস্থানীয় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে আমাকে কতকগুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অবিশ্বাসপূর্ণ প্রশ্ন করে। তার প্রশ্নের ভাব এই, আমাদের দেশের কিছুতেই কিছু হবে না। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাউন্সিলে গিয়ে, গভর্নমেণ্টকে বাধা প্রদান ক'রে ও মন্ত্রীদের তাড়িয়ে কি হবে? আমি উত্তরে বললাম—এসব না ক'রেই বা কি হবে? তারপর তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবকে লক্ষ্য করে আমি বললাম—"দেখ, তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম; আদর্শের প্রেরণায় তোমরা অসহযোগের পথে নেমেছ। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমার idealism (আদর্শানুরাগ) বেড়ে চলেছে, কিন্তু তোমার idealism দেখছি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।" তখন সে স্বীকার করলে যে, গত কয়েক বৎসরে নানা প্রকার আঘাত পেয়ে তার এরূপ ভাবান্তর হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গত দুই বৎসরে একটা সাময়িক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব বাঙ্গলাদেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এর ফলে আমাদের কর্মশক্তি কতকটা

পঙ্গু হয়ে পড়েছে কিন্তু জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলবার সময় এসেছে। অন্তরের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসরূপ গৃহশত্রুকে সর্বাগ্রে জয় করতে হবে, তা হলেই বাইরের শত্রুকে আমরা জয় করতে পারব। আজ বাঙ্গালীকে আবার দুর্জয় আত্মবিশ্বাস লাভ করতে হবে। আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে।

বাঙ্গলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দুই কারণে খুব আশা হয়:—(১) ব্যায়াম-চর্চা ও ভূপর্যটনের স্পৃহা (২) তরুণের জাগরণ। কাপুরুষ ব'লে বাঙ্গালীর একদিন পৃথিবীতে অপবাদ ছিল—সে অপবাদ এখন গেছে। বাঙ্গালীর পরম শত্রু যিনি, তিনিও বোধ হয় এখন বাঙ্গালীকে সে অপবাদ দিতে সাহসী হবেন না। এই কাপুরুষতার অপবাদ কে দিয়েছিল এবং কি উপায়ে সে অপবাদ বিদূরিত হয়েছে তা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে—এখানে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার অপবাদ এখনও আছে—সে অপবাদ বাঙ্গালীকে দূর করতে হবে। বাঙ্গালী যে আজ এই অপবাদ দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে সমিতির প্রতিষ্ঠা চলেছে—ইহা বড় আনন্দের বিষয়। এই অপবাদ যদি চিরকালের তরে দূর করতে হয়, তবে বাঙ্গালীকে জাতিহিসেবে সবল ও বীর্যবান হতে হবে। কয়েকজন ভুবনবিজয়ী পালোয়ান সৃষ্টি করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কারণ এরূপ পালোয়ানের শক্তি ও শৌর্যের গুণে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হলেও সাধারণ বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি হবে না। জাতিবিশেষের বিচার করতে হ'লে শুধু তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের দেখলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের দিকেও তাকাতে হবে।

বাঙ্গালীর যে আজকাল ভূপর্যটনের স্পৃহা জেগে উঠেছে, এটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক। বাঙ্গালী যে আজ ঘরের কোণ ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে, সাঁতার দিয়ে, সাইকেলে চড়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বাহির হবে, বিশ বৎসর পূর্বে কে এ কথা বিশ্বাস করত? অজানা দেশ দেখবার, অজানা পথে হাঁটবার, অজানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার, এই যে ব্যাকুলতা—এর থেকেই জাতিগঠন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে-সব জাতি স্বীয় গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না বা যেতে অপরাগ—তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। অপর দিকে যে সব জাতি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে, তাদের দিন দিন দৈহিক ও মানসিক উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ হয়ে থাকে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গেয়েছিলেন—"আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি"—তখন তিনি আমাদের সামনে ভ্রান্ত আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের এখন বলবার সময় এসেছে—

"আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

ঘরের কোণ ছেড়ে আমাদের এখন বিশ্বের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিজেদের দেশটাকে প্রত্যক্ষভাবে ভাল করে দেখতে হবে; তারপর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে হবে এবং অজানা অপরিচিত দেশ আবিষ্কার করতে হবে। যে-জাতি এরূপ করতে পারে তার শারীরিক বল, সাহস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ জাতি যে আজ এত উন্নত

এবং তারা যে আজ এত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের প্রবল ভ্রমণেচ্ছা তার অন্যতম কারণ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ না করলেও দেশ-বিদেশে ঘুরলে আমাদের হৃদয়টা যে বড় হবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে বেড়ে যাবে, আত্মবিশ্বাস যে বলবান্ হবে, বুদ্ধিবৃত্তি যে বিকাশ লাভ করবে—এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? তবে ভূপর্যটন থেকে ষোলআনা লাভ গ্রহণ করতে হলে প্রভূত ধনশালী আধুনিক আমেরিকান ভূপর্যটকদের মত না বেড়িয়ে যতদূর সম্ভব কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, সাইকেলে চড়ে বেড়াতে হবে।

আর একটা বড় আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে, আজকাল প্রায় সব জেলায় যুবকদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই চাঞ্চল্যই জীবনীশক্তির স্পন্দন। তরুণদের প্রাণ জেগেছে, তারা এখন নিজেদের কর্তব্য বুঝতে আরম্ভ করেছে—তাই এত জায়গায় যুবক-সমিতির অধিবেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় যে, তরুণরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু পথ ঠিক বুঝতে পারছে না। কেউ কেউ বলেন যে, নেতার অভাবে যুবকরা কিছু করে উঠতে পারছে না। নেতা খুঁজে না পেলেও এবং পথ ঠিক বুঝতে না পারলেও তরুণরা যে জেগেছে এবং স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝবার চেষ্টা করছে, এটা কম কথা নয়। এখন আমার বক্তব্য এই—নেতা যদি খুঁজে নাও পাও—তবে কি তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? তোমরাই নেতা সৃষ্টি করে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না—কাজের মধ্যে দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে। তারপর—"কঃ পন্থা?" ব'লে তোমরা যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছ—তা করলে চলবে না। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তোমরা নিজেরাই পথ আবিষ্কার কর। সমস্যাটা যত জটিল মনে কর, ততটা জটিল নয়। আমাদের আদর্শ এই যে, আমরা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর জাতি গড়ে তুলতে চাই—যে জাতি জ্ঞান ও কর্মে, শিক্ষা ও ধর্মে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতিদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। অতএব জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাগরণ আনতে হবে। কোনও দিকটা বাদ দিলে চলবে না। যার যেরূপ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা, তাকে তদনুরূপ কর্মক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। যার যেরূপ জন্মলব্ধ বা ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা—তাকে সেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলে দেশমাতৃকার চরণে তাহা অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করতে হবে।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে অনেক সাধক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ, কর্মবীর ও জননায়ক আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ক'রে দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে, পরলোকে গমন করেছেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থানের মধ্যে অনেকগুলি এখনও কেহ দখল করতে পারেন নাই। এটা কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম লজ্জার কথা? বাঙ্গালী যদি বেঁচে থাকে তবে এই শূন্য স্থানের মধ্যে অধিকাংশগুলি যাতে শীঘ্র অধিকৃত হয় তার জন্য মানুষের সৃষ্টি হওয়া উচিত। জাতি যতদিন প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকে ততদিন শূন্য স্থানগুলি এমনভাবে পড়ে থাকে না—মহাপুরুষদের অন্তর্ধানের পর নূতন মনীষিগণ এসে তাঁদের স্থান অধিকার করেন। যে-জাতি অনন্যমনা হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় নিরত থাকে—সে জাতির মধ্যে কোনও দিকেই প্রকৃত মানুষের অভাব কখনও হয় না। বাঙ্গলার সাধনা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই—সেইজন্য মনীষী বা নায়কের প্রস্থানের পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসন অধিকৃত হয় না।

সর্বাঙ্গসম্পন্ন জাতিকে চোখের সামনে রেখে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে—সে-সাধনা কখনও জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীয় জীবনের বহু দিক আছে—সব দিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রাণের বন্যা যখন জাতীয় শরীরে প্রবেশ

করবে তখন সব দিক দিয়েই তার বিকাশ হওয়া চাই। তা না হলে যে বস্তুর সৃষ্টি হবে তা কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না।

তরুণ বাঙ্গলাকে আত্মস্থ হতে হবে। বাহ্য শক্তির উপর নির্ভর না করে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। নূতন জাতি সৃষ্টির দায়িত্ব আজ তরুণ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে জীবন পণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আশার কথা এই যে, চারিদিকে এই সাধনার বিপুল আয়োজন চলছে। এই বিরাট যজ্ঞে শুধু আমরাই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব? তা হতেই পারে না; তাই বলি—হে আমার তরুণ জীবনের দল! এসো, আমরাও এই বাণী উচ্চারণ করে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হই—

"মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্"॥

আশ্বিন, ১৩৩৩।

পত্রাবলী

"তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ"

মান্দালয় জেল হইতে দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তকে ১৯২৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখিত।

মান্দালয় জেল
ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন—এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশবাসী কামনা করতে পারে না। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ ক'রে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চস্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি! স্বদেশসেবী হবার স্পর্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা, প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী হয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me..."

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী; কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গরাদ ও প্রস্তরের প্রাচীর! বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা একসময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর করে তুলছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখ ভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, এ কথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে Suffering বলে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যায় নাই, সে না পারে Suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে, না পারে Suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাকতে।

আমার দুঃখ শুধু এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। তা হবার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখনই খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আহ্বান এসে পেঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আট্‌কে রাখতে পারবে না।

এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কি না জানি না। জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর কত সত্য ক'রে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। 'দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতিকবিতায় বলেছেন, 'বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।' এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধবহ মুকুলিত

আম্রকানন, মন্দিরে-মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ"—এ সব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফত অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।'

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গজননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক—আমি বোধ হয় pedantic হ'য়ে পড়েছি। তবে এটা pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ থাকলে যা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne Branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি তাঁরা কাজকর্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের Orphanage-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনিতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

সমাজ সেবা ও কুটীর-শিল্প

॥ ১ ॥

দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাসের নিকট মান্দালয় জেল হইতে লিখিত। পত্রগুলি অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশিত হইল।

মান্দালয় জেল

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারা অপরের আগ্রহ ও সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবাকার্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি?

মাসিক ১৪০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম! বাড়ী ভাড়া কত দিতে হয়? বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে? কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন্ জাতির ছাত্র পড়িতে আসে? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন। দৈনিক রন্ধন কে করে? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে? কত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাইয়ের কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবি তৈয়ারি করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন?

বালকদের average intelligence কি রকম? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব।

বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না? ইতি—

॥ ২ ॥

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমার অনশন-ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না; তবে যে principle গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবি ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবিও গভর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "ইহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সবচেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবিপূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

* * *

Social service-এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Industries) কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্যপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীরশিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প-বিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কর্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখি না! Electroplating প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি

না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating-এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার polytechnic-এ গিয়াছি) polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটির পুতুলের কাজ আমরা কুটীর-শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা একাজ আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটির পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে যে-কোনও কর্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ-কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্মীকে খুব অল্পদিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নূতন কর্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘষিয়া বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত করা যায় এবং হয়তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তা দরে raw materials প্রভৃতি যোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিস বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব সময় দিতে হইবে। ইতি—

॥ ৩ ॥

মান্দালয় জেল

আপনি পূর্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনাপত্র, দেশ-বন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গত কাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ

যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে যে আমি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

* * *

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা সুতা-কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখন চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূর্ব পত্রে লিখিয়াছেন, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। দু'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে, কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন, (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয়, তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা এগুলি বর্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখানকার কুটীর-শিল্পগুলির যদি financial success না হয় তবে কর্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদন-মোহন বর্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ি, আচার, চাটনি প্রভৃতি তৈরি করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিসগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিস প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারি মাল পাইতে পারেন—(বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে দোকানদারের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কি না। Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিস ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব সুতরাং আম, লেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারি করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে, খুব conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব

ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারি হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার।

কলিকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর সেন্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি আত্মীয়স্বজন কলিকাতায় না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবক-সমিতি এ-কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা নাও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি. সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একটি উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীমবাজারের স্কুলে মাটির পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি খুব সুন্দর তৈয়ারি হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্বত্র, (বিশেষত মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এ দেশে আছে,—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল তোড়া ও ফুলসমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারি করা। জিনিসগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারি! ভদ্রঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারি কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বুঝি ফ্যাক্টরিতে তৈয়ারি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পল্লী-গ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্য এত সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সম্ভব কি না সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয়তো কিভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তি—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধ হয় ভাল হইবে। ইতি—

॥ ৪ ॥

দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির অন্যতম কর্মী
শ্রীমান হরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ।

মান্দালয় জেল
৩-৭-২৫

তোমার তিনখানা পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই না; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখাপড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্বে মাত্র দুইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে দু'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার সুযোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো। শুধু দান করা Organized Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা যে আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্যপ্রার্থীদের মনে জাগান উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয়—তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দু'একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

১। যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালি কাজ করিয়া তাহার যদি অন্য কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্যে সময় কাটাইতেছে কি না। এই জন্য inspection বা স্থানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

২। যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

৩। কাজ করাইতে হইলে variety of choice থাকা চাই, কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখিবে।

৪। যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পর্যন্ত সে-ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social service-এ অসীম ধৈর্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই raw materials (যেমন খবর-কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে। যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা

সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিস প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে তোমাদের জিনিস তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এইসব জিনিস তাহারা বিক্রয় করিয়া খরচ-খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানের খরচ (অন্তত আংশিক ভাবে) উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইব্রেরীর জন্য hap-hazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্বাগ্রে বাঙ্গলা, ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্তত কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আসুক না কেন, সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই।

* * *

দূরদেশে যদি সূতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সূতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই। যদি অন্তত খানিকটা সূতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশেপাশে তৈয়ারি না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশীদিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সূতা কাটিবে অথচ সূতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সূতায় যদি ধুতি বা শাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সূতা কাটিতে পারে। পূর্বে অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি এবং শাড়ি প্রস্তুত করাইত। এখনকার অবস্থা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে সূতা লইয়া ধুতি শাড়ি প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

চরিত্র-গঠন ও মানসিক উন্নতি

॥ ১ ॥

[দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীমান্ হরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ]

মান্দালয় জেল

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্মীর অভাব বড় বেশী। তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়া কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারি করাও যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্গলাদেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * *

তোমার মনের অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি না জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্ম-বিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুটি:—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা,

ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতির গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করা দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্বল পাপী' যে ভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে, সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্তশক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিস দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার এক দিক রিপু ধ্বংস করা, অপর দিক সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এ সব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion,' 'Jnan Yoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি, এল, রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন,' 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ; নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান'ও (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই; Victor-Hugo-র 'Les

Miserables' পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়ি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটি তালিকা পাঠাইব। ইতি—

॥ ২ ॥

মান্দালয় জেল

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। Muller-এর "My System" বই জোগাড় ক'রে যদি অদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক'রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই:—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা কম লাগে, (২) ব্যায়াম করলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশংকা নাই, (৩) শুধু অংগবিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের, মাংসপেশীর চালনা হয়, (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজে—যদি মুলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তাহা হইলে খুব উপকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজকর্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ-সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক দিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্বাংগীণ বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্বাংগীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শূন্যতা বা অভাববোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য চাই:—(১) ব্যায়াম-চর্চা, (২) নিয়মিত পাঠ, (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এ সব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজ-কর্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘন্টা বা দু'ঘন্টা সময় দিতে পারে তা হ'লে খুব উপকার হবে। মুলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘন্টা। এর সংগে যদি আর এক ঘণ্টা লেখাপড়ার জন্য রাখা হয় (খবর কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। অন্ততঃ-

পক্ষে এই দেড় ঘন্টা সময় করে নিতে হবে—তারপর "অধিকন্তু না দোষায়"—যত সময় বেশী দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি:

(ক) ধর্ম সম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য'—সুরেশ ভট্টাচার্য; ঐ—রমেশ চক্রবর্তী; ঐ ফকির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ চক্রবর্তী; (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ; (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'—বিবেকানন্দ; (৬) 'চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা'—বিবেকানন্দ; (৭) 'ভাববার কথা'—ঐ; 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি:—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাংগলার রূপ'—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক' ও 'পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'; (৮) ডি, এল, রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণাপ্রতাপ'; (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান'—কুমুদিনী বসু; (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচরিত'; (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ); (১৫) 'নব্য জাপান'—মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বইর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃপক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে, প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন facts শিখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নূতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সংগে সংগে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা

করবার বা মনে রাখার শক্তি ভাল রকম জাগে না। সে জন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন গরু, ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জিনিসগুলি চোখের সামনে না ধরলে শেখানো মুস্কিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্তু শেখান হয় যা ছাত্র কখনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তা-শক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখবার সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিসটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি, এবং শ্রবণশক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোনও জিনিস দেখবামাত্র স্পর্শ করতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফললাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগণিত শেখাবার সময় শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইট-পাথরের টুকরা দিয়া আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিস শিশুরা খুব শীঘ্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারি করা, মাটি দিয়ে মানচিত্র তৈরি করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে। পাঁচ রকম জিনিস শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখাপড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয় না। পাঁচ রকম জিনিস না শিখে ছাত্র যদি কেবল মুখস্থ ক'রে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখাপড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখাপড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক যদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখাপড়ায় সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিস প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যে গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই joy of creation শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারি করে। বাগানে বীজ পুঁতে গাছের সৃষ্টির দ্বারাই হোক, অথবা নিজের হাতে পুতুল তৈয়ারি করেই হোক, যে-কোনও বস্তু নূতন করে সৃষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের originality বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখাপড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়াম-চর্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলা করে, গান বাজনা শেখে, route march করে পথে পথে সংঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, clay modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারি করা) শেখে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। গল্পচ্ছলে শেখানো সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখাপড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে, তারা গল্প শুনছে অথবা খেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text book-এর আদৌ প্রয়োজন

নাই। গাছপালা, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছপালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দিবে। যে জিনিসই শেখাবে তা যেন সকল ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শেখাবে তখন মানচিত্র, globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গান শিক্ষা, Painting, drawing প্রভৃতি শিক্ষা, gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললাম। Text-book-এর কথা ইচ্ছে ক'রেই বলি না। Text-book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য-পুস্তক যেগুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার fundamental principles সর্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিস দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা করতে না পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুল ভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটি:—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী, (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যেতে পারে।

*　　*　　*

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

॥ ৩ ॥

মান্দালয় জেল
ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লভাবে সকল কর্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell," অবশ্য এ কথা কার্যে পরিণত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না; কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুললে চলিবে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না! ভগবানের কৃপায়

আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই; কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাকে বর্মের মত সর্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব—বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও—তুমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দূর হইলেও) মানুষ সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারিক সকল কর্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

॥ ৪ ॥

[তদানীন্তন 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক শ্রীগোপাললাল
সান্যালকে লিখিত পত্রাংশ]

ইনসিন জেল
৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলবার নাই।—"যথা পূর্বং তথা পরং।" পরিণামের কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোলআনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। জীবন-প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিষ্যতের কথা জানি না, তবে এখন পর্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশী দিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within," এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্ধারণ করেন তবে—"মৃত্যুরেব না সংশয়ঃ।" যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয়তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপব আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকতেও পারে। কিন্তু

জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান্ আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান্ আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধহয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতের সব কিছুই ক্ষণ-ভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ, সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তাধারা অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?

ষোলআনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোলআনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোলআনা পাইতে হইলে নিজের ষোলআনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি —renunciation and realisation একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখনই এই ষোলআনা পাওয়া ও ষোলআনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চশিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে "যমবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এখন দেখা যাক্।

Systematic study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূল-সমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের প্রয়োজন বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

* * *

ভগবান আপনাদের কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহার শুভ আশীষ নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

জেল ও কয়েদী

[নিম্নের পত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

॥ ১ ॥

মান্দালয় জেল
২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে, এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation"-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু এবার তা হয়নি। সেজন্য খুবই খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমল ভাবে স্পর্শ ক'রে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার "censor"-এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হ'য়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাব্‌ছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখ্‌তে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। এ-কথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেন না, সেটা নিছক ভণ্ডামি হ'য়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের

অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ-প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র—ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বলো একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারাশাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা'হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা থাক্‌ত তা'হলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধহয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাহাতেই ত আত্মা ও দেহের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শনবিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে; কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরের কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

'লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পেঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে,

অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে Martyr বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্পর্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিসটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিসটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশী দিনের মেয়াদের পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন ক'রে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটা অধীনতার শৃংখল ভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সংগীতের অভাব, যাহা সর্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকালবার্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সংগীদের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সংগীতচর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধুলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ-কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে, সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে, সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশী

উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেইখানে বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ ক'রে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ ক'রে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, 'মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে,—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দু আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃসংবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না; বরং আমার মনে হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ-কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

॥ ২ ॥

মান্দালয় জেল
২৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের বইটা পাইনি। অফিসে পার্শ্বেলটি খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিন্টেন্ডেন্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হ'লে কল্‌কাতায় C.I.D. অফিসে তিনি খোঁজ করবেন। তুমি D.I.G. C.I.D.-কে লিখে এ বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর "Prospects of Industrial Civilisation"-খানি বহরমপুর জেলে কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়,

তখন অনেকেই সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইখানা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে, একখানা পেলে শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখবার জন্যে দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে ভেবে উঠতে পারি নি। "Free Thought and Official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভাল ভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখানা হালের "বঙ্গবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম। আমি এখনও সেটা পড়ি নি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্মম সত্য। আমরা—সমগ্র জাতিটাই—যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও, আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয় হয়ে থাকে, বাঙ্গলার যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে বড় সর্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছ থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম, সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা পারলেও, আজ কিছু বলতে সাহস করছেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এত বড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়তো তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যেই যেন নির্দিষ্ট আছে। বেশী কম

যাই হোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ করে দিতে নাও পারে। কিন্তু এ তো নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russel যখন বলেছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটি সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস, যে সকল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভান করে যে ভণ্ড, সে-ই এ-কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয়তো তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদেরই (abstract point of view থেকে তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীন বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা তাকে পূজার সামগ্রী মনে ক'রে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে; নানাপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের এমন অনেকে আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণভাবে ভাববিবর্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্বত্র যারা কর্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এ-কথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়ুবিক দৌর্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয় এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্ম-নিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়তে বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে, একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্য অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয় নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু তার একটি পেশীর সংকোচনও বুঝতে পারা যায় নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটি কয়েদী আমাদের yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরানো পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারীদের ছায়া যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত

ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে; এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সব চেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—এ-কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব। ইতি—

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

দলাদলি ও বাংগলার ভবিষ্যৎ

[দক্ষিণ-কলিকাতা তরুণ সমিতির সম্পাদক ও দক্ষিণ-কলিকাতা চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিত]

মান্দালয় জেল

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা তো বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাংগলার সর্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরে কাজকর্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এরকম একজন লোকও কি আজ সারা বাংগলার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্য বাংগলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশ-সেবক হারাইয়াছে—আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাংগালী আজ অন্ধ, কলহ বিবাদে নিমগ্ন, তাই এই কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্ম-দানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না! অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের হলকার মত ত্যাগ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাংগালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাংগালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাংগালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাংগলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিক-

বৃন্দের ঝগড়া ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—কর্মচারীর পদ দাও—অন্ততঃপক্ষে কার্যকরী সমিতির সভ্য করিয়া দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারিতে, contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এত বড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম; আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ির কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ-কথা আমি পূর্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েকবৎসর পূর্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক, এখন তো "গতস্য শোচনা নাস্তি"। আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহনির্মাণ-ভাণ্ডার' সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি না। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটি নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, clay modelling, পুতুল নির্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির constition আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে, জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যবিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে, দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই! তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী-ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটি পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছেন যে, আমি বৃথা ছয় সাতটি বালকের জন্য এত অর্থব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্যভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি

কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র-নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব? এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্মরাজ্যে প্রবেশ করি —সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম। এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এই জন্য যে, আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

"এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।
* * *
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে
* * *
গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি আপনার কাজে!
* * *
কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ!"
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ!"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্য চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করিয়া পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট

[হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত ইংরেজী চিঠির অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ]

মান্দালয় জেল

আমি আপনাদের ইস্তাহার ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত লিখিত তাহার প্রতিবাদপত্র পাঠ করিয়াছি; এ পর্যন্ত সেনগুপ্তের প্রতিবাদের কোন প্রত্যুত্তর দেখি নাই। প্যাক্টকে পুনরায় গ্রহণ করিবার কথা উঠিতেই পারে না। গত সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে যখন প্যাক্ট গৃহীত হয়, তখনও ইহার বিরুদ্ধে একদল মূক প্রতিবাদী ছিলেন এবং দেশবন্ধু তাহা জানিতেন; শুধু গোপনে নয়, প্রকাশ্যে দেশবন্ধু বার বার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য, দেশের দুই সম্প্রদায়ের মিলনের একটি স্পষ্ট ভিত্তি স্থাপন করা।

এই জন্য উক্ত প্যাক্ট-এর দুই একটি অংশ বা বিধি যদি উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী বা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে সেগুলির পরিবর্তনে তাঁহার আপত্তি ছিল না। যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, গত কোকনদ কংগ্রেসে তিনি এরূপও বলিয়াছিলেন যে, বেঙ্গল প্যাক্ট এখনই কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হোক, তিনি ইহা চান না। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই ছিল যে, উক্ত প্যাক্ট যেন নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি দ্বারা আলোচিত হয়।

কিন্তু তখন সমগ্র কংগ্রেস ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং কংগ্রেসের সভ্যগণ তখন প্যাক্ট আলোচনা করিতেও স্বীকৃত হন নাই। কোকনদ কংগ্রেসের পর সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে প্যাক্ট গৃহীত হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু প্যাক্ট গ্রহণের পূর্বেও দেশবন্ধু সকলকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি প্যাক্ট সম্পর্কে কোনরূপ তর্ক বা আপোসের কথা শুনিবেন না, এরূপ নয়; বরং প্যাক্ট-এর কোনও কোনও অংশ বা বিধির পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে স্বীকৃত ছিলেন।

আমার এইজন্য মনে হয়, দেশবন্ধুর অনুরক্ত ভক্ত হইয়াও প্যাক্ট-এর কোনও কোনও

অংশ পরিবর্তন করিবার অধিকার দাবি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও মনে করি, মাত্র দেশবন্ধুকে লইয়া বা তাঁহার মৃত্যুর পর হাতজোড় করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির মুখ চাহিয়া বাঙ্গলার সমস্যা মীমাংসার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা নিখিল-ভারতের দিক হইতে মীমাংসিত হইলেও বাঙ্গলার সমস্যা বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে।

সংবাদপত্র পাঠে যতদূর সম্ভব আমি বর্তমান ঘটনাস্রোত অনুসরণ করিয়া কয়েকটি দৃঢ় ধারণা লাভ করিয়াছি। বর্তমানের বিপদসঙ্কুল সময়ে আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী অভাব—সকল বিষয়ে স্পষ্ট দূরদর্শিতা।...ইতি—

কারামুক্তির প্রস্তাবের উত্তর

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে
লিখিত ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ]

ইনসিন সেন্ট্রাল জেল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

দাদা,

মিঃ মোবালীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবালীর প্রস্তাব বারবার অতি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ, প্রতি কথা বারবার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোনও নির্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবালীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবালীর কয়েকটি কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্যকাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া

বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মান-বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য রূপে আমি মাননীয় সভ্যের এরূপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থাস্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতামতের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা বা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি আমাকে জানাইলেন, আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনকে কিরূপভাবে রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষ্মারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান্ রোগী সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই, এবং একেবারে কর্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারেই কর্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেইদিন কি? তা ছাড়া ছোটদাদার রোগ-বিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাঁহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না বা বিদেশে যাইবার পূর্বে আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে

জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যতদিন অর্ডিন্যান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে। তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা, (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিন্যান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত—বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন সম্বন্ধে ১৯৩০ সালের পরও পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি, আই, ডি, পুলিশের কর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিন্যান্স আইন চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ-সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি, আই, ডি, বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চোখেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মাণ ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিস্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিন্যান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতে পার্লামেন্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিশের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্যতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু

না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকারপক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেলিনগ্রাড পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে মনে ভাবিলাম, সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙগলা দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি? যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার জীবন ও কার্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি বাঙগলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য করি নাই, এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙগলাকেই আমি আমার কার্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙগলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন কার্যে বাঙগলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল তো খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত-সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙগলা-সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃস্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা-কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কন্‌ফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কন্‌ফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাড়ুদারদিগের ধর্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪

খৃস্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিস্টার মোবার্লী একটি বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমি নির্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালোবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্যদেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশীয়রা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে, অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্যর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙগলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙগলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিন্যান্স আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক

রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবালীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিন্যান্স আইনের কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে-কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি:—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্বাপেক্ষা অধিক। সেজন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন। ইতি—

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

জীবনের লক্ষ্য

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মহাশয়ের
নিকট লিখিত চিঠির বঙ্গানুবাদ]

ইনসিন জেল
৬ই মে, ১৯২৭

দাদা,

দীর্ঘ পত্র লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই; আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্নমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সহিত আমার অনেক আলাপ হইয়াছে। আমার এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। মান্যবর স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার সহিত এ পর্যন্ত যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছিল, এই ব্যবহার তাহা হইতে পৃথক।

গবর্নমেন্টের উত্তর, বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানাইয়াছিলেন। এই উত্তরে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হইয়াছে। ১১ই এপ্রিল তারিখে গবর্নমেন্টের শর্তের আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম, বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমি পুনরায় সেই উত্তরই ঠিক বলিয়া মনে করিতেছি।

আমার সিদ্ধান্ত—সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হয়; ***জীবনকে সহজভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ভুল ভাবে বিচার করিবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হইয়াছে। কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল এবং সংঘর্ষাত্মক। হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরি বার্গস-এর ELan Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজোরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার

নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গবর্নমেন্টের শর্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর শর্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেন্ট পল বলিয়াছেন—

"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা পৃথিবীর অন্ধকারের নায়ক, আমাদের সংগ্রাম উচ্চপদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য, সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধান-কর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাইব কিনা বর্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে পারি না। বর্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে আমি অক্ষম। বর্তমানে প্রথমতঃ ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইবে। কতদিনে আমি সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অন্ততঃ আরও অনেকটা সুস্থ হইবার পূর্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। আবার আমি যদি ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশানুরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়া না লইলে সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার আবশ্যকতাই বা কি?

অতঃপর সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষ ভাবে পিতামাতার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এবং বাঙলা সরকারের ধারণাও পরিবর্তিত হইতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোন-

রূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্তা চালান বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান্—অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান্—আমরা তাঁহাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যে, যাঁহারা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থাসম্পন্ন তাঁহারা পরস্পরের সুখের ও দুঃখের অংশ সমান-ভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিবৃন্দের নিকট নিবেদন

ফেল্‌সল্‌ লজ
শিলং
১০।৮।২৭

শ্রদ্ধাপুরঃসর নিবেদন,

গত বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের সময়ে আমি উত্তর-কলিকাতায় অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াই। তদুপলক্ষে মান্দালয় জেলে অবস্থানকালে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদিগকে যে নিবেদন-পত্র পাঠাই তাহা আপনাদের নিকট পেঁছায় নাই। কর্তৃপক্ষেরা যে কারণেই হউক সে নিবেদন-পত্র কেন আটকাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই। তারপর আমার নির্বাচন সম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের নিকট যে পত্র দিই তাহার মধ্যে অনেকগুলি গন্তব্যস্থানে পেঁছাইতে পারে নাই। আমার কারারুদ্ধ অবস্থায় গবর্নমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট শুনিয়াছি যে, আমি যাহাতে কারাগৃহ হইতে নির্বাচন সম্পর্কীয় কোন কাজ চালাইতে না পারি—ইহাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু আমার নিবেদন-পত্র আপনাদের হস্তে না পেঁছাইলেও বোধ করি কারার নীরব আকুল নিবেদন আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই আপনারা আমার নিবেদন না শুনিয়াই অতি-প্রবল যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এত বেশী ভোট দিয়া নির্বাচিত করিয়াছিলেন। যেদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে মান্দালয় জেলের নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমরা কয়েকজন রাজবন্দী সাফল্যের সংবাদ পাই—সে সময়ে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপায় আমার ছিল না। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, গিরি নদী এবং অরণ্যানীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমার হৃদয়ের বাণী আপনাদের নিকট পেঁছিয়াছিল।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, যে অবস্থায় পড়িলে সাধারণতঃ বন্ধুকে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও চিনিতে পারে না, ঠিক সেই অবস্থায়—রাজপুরুষগণ কর্তৃক যখন আমি লাঞ্ছিত—আপনারা আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিতে বিচলিত না হইয়া আমাকে সম্মানের উচ্চ বেদীতে বসাইয়াছেন। আমার উপর ঈদৃশ প্রীতি ও বিশ্বাস দেখাইয়া আপনারা যে শুধু আমাকে ধন্য করিয়াছেন তাহা নয়—আপনারা সকল রাজবন্দীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

কারাবাসী থাকিতে আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার ও দেশের বর্তমান সমস্যা বিষয়ে আপনাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, যখন মুক্তি পাইব তখন এই দুইটি কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব। মুক্তিলাভের আশা পূর্বে মোটেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ যে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্ত হইলাম সেই দিন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাগত। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যাহা কর্তব্য আমার মুক্তির পর আমি আজ পর্যন্ত তাহা করিতে পারি নাই। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আপনাদের সহিত পরিচয় স্থাপন না করিয়াই আরোগ্য লাভের আশায় আমাকে এখানে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। কর্মক্ষেত্রে নামিতে এখনো বিলম্ব আছে, অথচ এখন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি, এই নিমিত্ত স্থির করিলাম যে, আপাততঃ পত্রের দ্বারাই আপনাদিগকে আমার নিবেদন জানাইব।

আমার মুক্তির পর আপনারা আমাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং আমার আরোগ্য ও মঙ্গল কামনার্থে যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। আপনারা আমায় সেবার অধিকার দিয়া ধন্য করিয়াছেন; আমি যাহাতে সেই অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি তাহাই আমার একান্ত কামনা। আপনারা আমার উপর প্রীতি ও বিশ্বাস প্রদর্শনের দ্বারা আমায় সম্মানিত করিয়াছেন; আমি যেন তার কথঞ্চিৎ যোগ্য হইতে পারি—ইহাই ভগবানের চরণে আমার আকুল প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে বিলম্ব থাকিলেও আপনাদের আশীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছার ফলে আমি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে চলিয়াছি। কিন্তু শারীরিক সুস্থতা লাভ করিলেও মানসিক শান্তিলাভ করা সহজ নয়। বাঙলার এতগুলি স্বদেশ-বৎসল যোগ্য সন্তান যখন বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে কারাক্লেশে নিষ্পিষ্ট হইতেছেন, বাঙলার এতগুলি নর-নারী যখন কারারুদ্ধ প্রিয়জনের দুঃখ কষ্ট ও দৈনন্দিন লাঞ্ছনার চিন্তায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে অসহায় ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন—বাঙলার এতগুলি গৃহ যখন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, ভাই, স্বামী ও পিতার বিহনে শ্মশান-প্রায় হইয়াছে—তখন কোন্ বাঙালী নিশ্চিন্ত মনে আহার-নিদ্রায় কাল কাটাইতে পারে! বাঙলার গবর্নর আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমি এবার কাউন্সিলে উপস্থিত না হইলেও সদস্য তালিকা হইতে আমার নাম কাটা যাইবে না। কিন্তু তবুও ইচ্ছা করে যে কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে রাজবন্দীদের কথা যখন উত্থাপিত হইবে তখন আমি উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করি। চিকিৎসকদের অনুমতি পাইব কি না জানি না, যদি পাই তবে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়া প্রতিনিধির কর্তব্য যথাশক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিব। যদি যাইতে পারি এই আশায় কতগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্নের নোটিশ যথাসময়ে কাউন্সিলের জন্য পাঠাইয়াছি। কিন্তু যদি চিকিৎসকদের অনুমতি না পাই তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব আরোগ্যলাভ করিয়া যাহাতে জনসেবার্থ পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহার জন্য সচেষ্ট হইব। চারিদিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাতির জীবনস্রোতে আবার যখন বানের ডাক আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে তখন যেন কায়মনে প্রস্তুত থাকিতে পারি, ইহাই সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

কিমধিকং। আপনারা আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ইতি—

উত্তর-কলিকাতা অধিবাসিগণের নিকট নিবেদন

[*মান্দালয় জেল হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ তারিখে লিখিত নিবেদন-পত্রটি কর্তৃপক্ষ আটক করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল]

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্বাচনদ্বন্দ্বে আমি জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস কমিটি) কর্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জন্য সভ্যপদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যের সংবাদ পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থিগণের উপদেশে এবং দেশের ও দশের সেবার অধিকতর সুযোগ পাইবার ভরসায় আমি জাতীয় মহাসমিতির আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি। আমি কারাবাসী না হইলে সদস্য-পদপ্রার্থী হইবার পূর্বেই যে ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতামত লইতাম, আমার বর্তমান অবস্থায় আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কি না এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে কি না—সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। জাতীয় মহাসমিতিও এ বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে স্থির করিয়া আমাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত থাকিলে তিনিও আমাকে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে আদেশ করিতেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্বাচনের সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ও বর্তমান অবস্থায় আমার নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যও যে আমার এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য অনেকটা দায়ী তাহা বলা বাহুল্য। সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গবর্নমেন্ট কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গবর্নমেন্টের কোনও

আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবকহিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত!

তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—"স্বপন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবি করিতে পারি।

পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন উচ্ছল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব —এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি—তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কন্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা

নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমাময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে জীবনের পথে চলিব; এই সংকল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্বমংগলময় ভগবান্ আমার সহায় হউন।

আমার এই উপস্থিত সমস্যার সমাধান আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম, কারণ এ নির্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে? দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি। আজ সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও কি আপনাদের উপর আমার কোন দাবি নাই? আমি প্রার্থনা করি, আপনারা ভুলিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতীয় মহাসভার জয়, জনমতের জয়, আপনাদের জয়। সম্মুখে যে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা—সব কিছু। আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারা আমাকে সেবার সুযোগ ও অধিকার দিয়া ধন্য করিবেন। আর অধিক কি বলিব—দেশমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহ আপনারা। সাগরপারের বন্দীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

দেশবন্ধু

॥ ১ ॥

[পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

মান্দালয় জেল
১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার "স্মৃতিকথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হালকা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়-দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তার অনুগ্রহ, কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয়তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ

ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে। "...আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই; অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানা প্রকার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাঙ্গলার সব খবর-কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে তো কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধ'রত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণগৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল ক'রল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর-কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা' বাহিরের লোকে জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধর-পাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে, একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়

না। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধ'রে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিত—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবি নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কি না—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল। তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা; কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থা, তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্বপ্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে-মুহূর্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি দেশবন্ধুর সহকর্মী ও অনুগত কর্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ; কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না।***দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্মীর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন!

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে, কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বলকমা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধুর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হ'তে পারে না, আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে

—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে! পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল—বাঙলার আকাশ, বাঙলার বাতাস —এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবি করবার মত ভরসা রাখি না, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o. D.I.G.I.B., C.I.D,
13 Elysium Row,
Calcutta.

॥ ২ ॥

[দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত]

মান্দালয় জেল
২০।২।২৬

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্তলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীকে

খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশংকা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাংগলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

* * *

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া বলিলাম "আপনার সংগে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অংকিত আছে এবং বোধ করি, চিরকাল অংকিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার ভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহাকে ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মংগলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত

করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ দিলে* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংসা-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক অনুচরবৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়তো মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট-আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুস্কিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করিতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরংগ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সংঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্বিশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মীগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন

---

*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃংখল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশবশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃংখলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন—

(ব্রহ্ম ভাষায়)

বৌঢান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
ঢম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধম্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুতঃ, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা—সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্ কাজ এ জগতে সম্ভব নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্তায় তিনি সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়-বশতঃ তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন. কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা. যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাঁহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা করি বিনয়রূপ পরম

সম্পদ তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত আটমাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্নমেন্টের কৃপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'familiarity breeds contempt'—বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ!" তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া, রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত-নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত। আমি তাঁহার এই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম। আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বাবস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সবজ ও অনাবিল ছিল যে, বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতাম না।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল. তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে

ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু একসময়ে শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল, খত পরিবর্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার শত্রু অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী

ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এই জন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না? দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, শুধু তাঁহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথাও মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, এ-কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জনসাধারণের জন্য" এ-কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পূর্বেও এই মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পও আমরা সকলে

জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সংকল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানো চোর", মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশঃ সে আমাদের সকলের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে, তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সে সংকল্প করিল যে, অতঃপর সে অসৎ কাজ ও অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বৎসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল—তারপরে যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি!" আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর পাইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les Miserable-এর কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার-প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কি না জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত-মিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক,

মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্তমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষাও (culture) তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্যসমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুকরণ করে? বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নিরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মতহিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সব বর্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সে লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়: তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নৈতিমার্গ হইতে পারেন না—এ-কথা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিশ্বসংসারকে, তথা মানুষ্য জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে যে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ

দূর হইয়া যায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তব-রূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "দেখ তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টান) ভগবানকে পিতৃ-রূপে আরোধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী তর্জমা—father land, আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি, কিন্তু ইংরেজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শাক্ত ধর্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরকস্য দ্বারম্"—এ কথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ চিন্তা-জগতে ও কর্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন—তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু যেরূপ গভীর-ভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা (culture) এক, না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু—তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলতঃ যদিও

মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশ-লাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্তা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশ সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন করিয়া অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশ-প্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যন্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভাল বাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খৃঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খৃঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সংকল্প করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্"। এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল। দুর্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্তনাদ অথবা অনুচর-বর্গের সাবধান বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন—সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্পস্ (Alps)

পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস্ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না—তিনিও সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা pessimist)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশংকা—সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"you young old men"—ওহে অকাল-বৃদ্ধ যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতির ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন—তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চিরনবীন—চির-তরুণ—তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন; তাহাদের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন—তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

তাঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছেন—সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা পাইয়াছি। তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন যে, যখন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্রমশঃ ওতপ্রোতভাবে তাঁহার প্রাণমনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহংকার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশবন্ধুর হইয়াছিল তাহাই; তাঁহার জীবনের শেষদিকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশঃ এই ধারণা জন্মিয়াছিল—যত্র দাশ মহাশয়, তত্র জয়।

তিনি কত রকম লোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অনুপ্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাঁহার ধর্মজীবনের সোপান স্বরূপ।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকী থাকে কে বলিতে পারে? ভোগের অত্যুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু রমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণের রাজা। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—তরুণের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের

পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুরের মামলায় অরবিন্দবাবুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়?

নূতনের সন্ধান

ছাত্র আন্দোলন

"ছাত্র-জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা। দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত; এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে।"

ছাত্রমণ্ডলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না, কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই; আমি চাই তাদের ভালবাসা, আমি চাই তাদের আপন হতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।

আমি ছাত্রদের ভালবাসি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বুঝি। ছাত্রজীবনে কি লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্র-সমাজের মর্মের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি।

যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না—যে সমাজে ছাত্রেরা শিশুবৎ, কেবল কৃপার ও উপদেশের পাত্র—সে সমাজে মনুষ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমরা মুখে বলি —"প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ"—কিন্তু ব্যবহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশুজ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র খোকার ন্যায় ব্যবহার পায়—এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আর দুঃখের বিষয় এই, আমরা এরূপ ব্যবহারে লজ্জা বোধ না করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি! প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না, তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসিলে কি বিস্মিত হইবার কোনও হেতু আছে?

হিন্দুজাতি তো গর্ব করিয়া থাকে যে, তাহারা মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দুজাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন—"আমাদের

সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা—এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় কি না?"

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারী-সমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ-সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহা সহ্য করিত না। আজ যদি বাঙ্গলা দেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরাজকে তোমরা হয়তো ঘৃণা করিয়া থাক—কিন্তু আমি বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার নারীজাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা কর ইংরাজের নিকট। তোমার দেশে তোমার মা ও ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা হয় না—আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরাজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিস্ এলিসের পাঠান কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি? জননীকে ভালবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাসা। বাঙ্গলা দেশ—বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রাণধর্ম বাঙ্গলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাঙ্গলার মাতৃ-জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না—সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে? যে ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না—ভালবাসে না—সে কি করিয়া মানুষ হইবে? মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না—যে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—সে পাত্রকে যে ভালবাসে না—সে ব্যক্তি কোনও দিন মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর—সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন-মনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ: মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

মনে রাখিও সেই কথা—যাহা বহুযুগ পূর্বে মনু বলিয়াছিলেন:—

"যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বিবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥"

"যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সে দেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়

এবং যে কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই—সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।" যে যুগে এ দেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গীর মত ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর মত বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান্সির রাণীর মত বীর-রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোনার বাঙ্গলায়ও আমরা একদিন রাণীভবানী, দেবীচৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম।

আমরা ছাত্রবন্ধুরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছাত্র সম্মিলনীতে আমি এ সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি? কিন্তু বড় ব্যথা পাইয়া একথা আমি আজ বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নারী সমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে, সে পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃ-জাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এ দেশের নারী-জাতি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মত অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।

যদি এই সব নীতি কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদের গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বহুযুগসঞ্চিত কুসংস্কার বশতঃ যাঁহারা ধর্ম ও লোকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই সব প্রাচীনপন্থীরা হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্য প্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয়—দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনও দিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময় মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের অবস্থার মত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনও যুবক-সমাজ ও ছাত্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পান নাই। অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করি না। কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট, পুলিশের নিকট, গবর্ন-মেণ্টের নিকট, এবং সমাজের নিকট যে সমাদর—এমন কি শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে। আর আমাদের ছাত্ররা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র, বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবালকের তুল্য এবং পুলিশ ও গবর্ন-মেণ্টের নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কি করিয়া সম্ভব? স্বাধীন দেশের ছাত্র-সমাজ যে সমাদর ও

শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয়। আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আমাদের ছাত্রেরা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়।

তবে আশার কথা এই যে, এখনকার ছাত্রেরা আর নিশ্চেষ্ট নয়। সমাজের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা নিজেদের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ছাত্রসমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এ দেশের ছাত্রসমাজও ক্রমশঃ অর্জন করিবেন—নিজের শক্তি, সাধনা ও যোগ্যতার বলে; শ্রীযুক্ত খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত ছাত্র আজ সমস্ত দেশ ও সকল শ্রেণীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করিয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শক্তির বলে। ঠিক এমনই ভাবে বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ ক্রমশঃ আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

ভ্রান্ত আদর্শ

মানুষের উন্নতির পথে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষ যখন কোনও সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোন নীতির দোহাই দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। বর্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগের দেশসেবার কার্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে—হয়তো বড় চাকুরী পাইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি—এ কথা সত্য কিন্তু সে সব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পেঁছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নূতন পথে নূতন ভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। যখন মানুষের অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত কল্পনা-শক্তি ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষ তখন ভালবাসিতে পারে—তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারে—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ভাবের তরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে পারে।

সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাট্‌কা রাঙ্গা ফুলেই দেবীর

আরাধনা হইয়া থাকে, পুরানো বাসী ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদেরও হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম-রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ কর।

সে আদর্শ কি—যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, অসীমাশক্তির পরিচয় পায়? সে আদর্শ কি—যাহার পুণ্যপরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড় হইয়াই জন্মায়—তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড় হইতে হয় না।

কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহার সে মহত্ত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিবে যে প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমরা যদি সেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটী সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মানুষ্যসমাজকে মুগ্ধ করিবে

যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার তরুণ ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলি—

"হে ভারত, আজ নবীন বরষে—
শুন এ কবির গান
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।"

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষা দীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে—সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; এক কথায় শরীর মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজকাল স্কুল ও কলেজে "ভাল ছেলে" নামে এক-শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট—পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবার্ট ক্লাইভকে। এই "বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো" ছেলে সাত-সমুদ্র-তের-নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরাজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে। ইংলণ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল "বকাটে" রবার্ট ক্লাইভ! ইংরাজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে জানে তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। "বকাটে" রবার্ট শেষ জীবনে হইল লর্ড ক্লাইভ!

ইংরাজ—তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের spirit of adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও "সদূরের পিয়াস" আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গ-মালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্ম-বিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে, তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নব-জাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি গাহিয়াছিলেন:—

"আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
* * *
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান॥"

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী—আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা জাতি হিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণসমাজ লাভ করিতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে নির্ভীক-হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না—পাইব নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা—পাইব সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়—সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজি তোমাদের মতই একজন ছাত্র খড়্গ বাহাদুর সিংহ মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার পুরস্কারস্বরূপ বরেণ্য বীররূপে ভারতপূজ্য হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যে সব Goldmedallist ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একত্র করিলেও একজন খড়্গ বাহাদুর তৈয়ারী হইবে না।

স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে—চিরকালের জন্য জীবনের স্রোত সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে—সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

আর একটি কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব। ছাত্র সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের উদ্ধার যে তাহাদের করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যে তাহাদের আছে—একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর বিশ্বাস না পাইলে মানুষ কোনও বড় কাজ করিতে পারে না। বাঙ্গলার তরুণসমাজের উপর, ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি—তাই তারাও আমাকে ভালবাসে। ছাত্রবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যেদিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যেদিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যেদিন মরণজয়ী হইবে, সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় সে সব সংবাদ পাইবে। আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে। নিজেদের মধ্যে esprit d'corps বা সংঘবদ্ধতার অনুশীলন করিতে হইবে—ছাত্রগণের সময়োপযোগী গান বাঁধিতে হইবে। পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে—যেমন কলিকাতা কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। Volunteer Organisation-এর সাহায্যে ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্তিতা। এই সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংহতশক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism-এর সৃষ্টি হইবে। এখন আমাদের ছাত্রদলের মধ্যে এই class patriotism-এর আবশ্যকতা হইয়াছে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এবং সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম, এখনও ছাত্র আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তোমরা গ্রহণ কর।

গত ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৩৬ শ্রীহট্টে সুর্মা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তথায় গমন করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার লিখিত অভিযোগ তথায় পাঠাইয়া দেন; সম্মিলনের সভাপতি তাহা সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন। উপরে তাহা প্রকাশিত হইল।

॥ দুই ॥

"প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই আদর্শকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়।"

আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন। তবে সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে আমার হইয়াছে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমি মনে করি, আমি আপনাদের মতই ছাত্র; "জীবন বেদ" আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত।

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সে ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই idealকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আদর্শের ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তি এক দিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবৎসর-ব্যাপী হইয়া থাকে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন—আদর্শ একটা প্রাণহীন গতীহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে।

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করিতেছে, আমরা তার পরিচয় সব সময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহ্য ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীরূপা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম—the idea of the age. ইহার উপলব্ধি হইলে মানুষ বুঝিতে পারে তার পথ কি, তার পথপ্রদর্শক কে?

কিন্তু এই উপলব্ধি সব সময়ে হয় না বলিয়া আমরা প্রায়ই ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই এবং ভ্রান্ত গুরুর অনুবর্তী হইয়া থাকি। হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও—তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাঙ্গলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী ষড়রিপু জয় করিবার, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন, "man-making is my mission"—খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা

একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্ম-সমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তা-সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বে যখন আমাদের দেশের নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যে সব অধর্ম চলিতে-ছিল এবং যে সব আবর্জনা ও কুসংস্কার ধর্মের নামে সমাজ-দেহকে আচ্ছাদন করিয়া-ছিল এবং হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদান্তের সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দু সমাজ-ধর্মের বহিরাবরণ বর্জন করিয়া সত্য ধর্ম আশ্রয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আগে চিন্তা-জগতে আলোড়ন উপস্থিত করা দরকার—তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবর্তিত করিলেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের যুগে সমাজ সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাণীর ফলে সমগ্র দেশে নব জাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যেও জাগরণের সূচনা হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে তখনও দেখা যায় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতে-ছিল যে, ইংরাজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা divine dispensation. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। "Freedom, freedom is the song of the soul," এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁর সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া—এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে, সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া এবং বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি জাতিকে একটা সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরও দূরে সরিয়া গেল। তার পর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহ বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিন্দের মুখে আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনতে পাই। অরবিন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লিখিলেন— "We want complete autonomy free from British control" —তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙ্গালী বুঝিল যে, এতদিন পরে সে মনের মত মানুষ পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর হইল। এখনও কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—

"I should like to see some of you becoming great; great, not for your own sake, but to make India great—so that she may stand up with head erect among the free nations of the world."

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করিয়া, বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর সাথে সাথে আমরা আর একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে—"জনসাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাঙ্গলা দেশে নূতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে "গণবাণী" মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায়, তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কথা।

এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, স্বরাজ তিনি লাভ করিতে চান —তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, জনসাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses" এই আদর্শ তিনি নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আর একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই—সেটা এই যে, মানুষের জীবন —জাতির এবং ব্যক্তির জীবন—একটা অখণ্ড সত্য। এই জীবনকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা সব দিক দিয়া জাগরণের পরিচয় দেয় এবং সর্বক্ষেত্রে নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজগৎ—তথা মনুষ্যজীবন—বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের লোপ সাধন করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না—বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের নিকটবর্তী হইব। তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং জাতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতে "এক" এবং "বহুর" মধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন—সে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু "শিক্ষার মিলনে" যেরূপ বিশ্বাস করিতেন "শিক্ষার বিরোধে"ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন—এক কথায় তিনি Federation of Cultures-এ বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতার প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যেও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে Centralised State অপেক্ষা Federal State বেশী পছন্দ করিতেন।

যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এ যুগের সাধনা।

এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আগে দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের তরুণ সমাজকে বলিয়া দিতে হইবে, যে-স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি—সে রাজ্যে সকলে মুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি—এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানব জাতিকে—দেশবাসীকে, মুক্ত করিতে চাই।

যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে—অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনও বিপ্লব আনিবে না—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্বশ্রী ফিরিয়া আসে তেমনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না—Thus far and no further.

আমাদের এই শত ছিদ্র-যুক্ত, পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কোনও দিন হইবে না; পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনীতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনীতিক অত্যাচারই সব চেয়ে বড় সত্য—সে ব্যক্তি এই সব অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে কেন?

আজ এই কথাটি আমি খুব বড় করিয়া এখানকার ছাত্র সমাজের মধ্যে বলিতে আসিয়াছি—যে যুগে আপনারা জন্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম—পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জাতি জন্মিতে চায়—বর্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। "পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে"—এ অবস্থায় আর কত দিন চলিবে? আর আমাদের নারী সমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা কত দিন আর বলিব—

"সচল হয়েও অচল সে যে
বস্তার চেয়েও ভারী,
মানুষ হয়েও সং-এর পুতুল
বঙ্গদেশের নারী।"

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাঁসিকাষ্ঠের এবং সামাজিক স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দর্শন করেন উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা। কিন্তু আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়ে ভীত নহি, মানুষের মধ্যে যদি ভগবান বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে—যদি ভগবান সত্য হন—যদি মানুষ সত্য হয়—তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার মদিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হই তাহা হইলেও অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে দাবী—তাহা ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবী বই আর

কিছু নয় (the right to make blunders), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা না দেখিয়া মুক্তপথে আগুয়ান হও; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও।

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড় সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথা-কথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বল—তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও।

হে বাঙ্গলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে—অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক।

যে দিন ভারত পরাধীন হইয়াছে—সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা (Collective Sadhana) ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আমাদের জাতির বহুলোক—পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করিয়া আসিতেছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে নাই। আজ হইতে তাহাকে উহার অধিকারী করিয়া দিতে হইবে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই—সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবী ও সমান সুযোগ থাকিবে। যে দিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সে দিন সমস্ত সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইবে।

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—এখন চাই নূতন রক্ত। ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—বহুবার রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বর্ণসংকরের ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানববিজ্ঞান (anthropology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়া রক্ত-সংমিশ্রণের সহায়তা করিতে হইবে। এখন এই রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটাইবার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে অসবর্ণ বিবাহ বহুকাল নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া আমার মনে হয় যে, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট রক্তসংমিশ্রণ ঘটিবে এবং এই রক্তসংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা-মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়। স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য আজ তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধর। স্বাধীনতার পূর্বাস্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে। এই আস্বাদ—এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই। নিজের অন্তরে এই আলোক

জ্বালো—সেই দীপ হস্তে লইয়াই দেশবাসীর দ্বারস্থ হও। যাও চীনা ছাত্রদের মত—রুশ তরুণদের মত—চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্ন গৃহে। তাহাদের জাগাও। আর যাও—মাতৃজাতির সমীপে। যাঁরা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ যাঁরা হইয়াছেন—"অবলা"—তাঁদেরও জাগাও—বল—

"আপনার মান রাখিতে জননী,
আপনি কৃপাণ ধর।"

সর্বোপরি যাও দলে দলে বাঙ্গলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বল—"ভাই, এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো—এ বীরভোগ্য বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা।"

জিজ্ঞাসা করি—একাজ করতে পারবে? হাঁ পারবে, অবশ্য পারবে। তোমরা পারবে এ কাজ করতে—এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি। এগিয়ে চলো—জয়লাভ তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক—ভারত আবার মুক্ত হউক—তোমাদের জীবনও সার্থক হউক।

[হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন—সভাপতির ভাষণ; ২১শে জুলাই ১৯২৯]

॥ তিন ॥

"আজিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম যে সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত করিয়া দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান্, ইহা তাঁহাদের আন্দোলন।"

"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ, ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারে।...সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।...জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে—তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের সুর!...জগতের সভ্যতার প্রতি ভারতবর্ষের একটা নব অবদান আছে!...স্বাধীনতাই জীবন—স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে আছে অবিনশ্বর গৌরব।"

পঞ্জাব-নিবাসী ভাই-ভগিনীগণ,

পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে আমার এই প্রথম পদার্পণের দিনে আপনারা আমাকে যে সস্নেহ অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি যে আপনাদের সম্মান ও অভ্যর্থনার যোগ্য নহি তাহা আমি জানি—তাই আজ আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, এখানে যে সৌজন্য ও আতিথেয়তা আমি পাইয়াছি, তাহার কিছু যোগ্যতা যেন অর্জন করিতে পারি।

আপনাদের কাছে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আপনারা সুদূর কলিকাতা হইতে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমাকেই আপনারা আহ্বান করিয়াছেন কেন? পূর্ব ও পশ্চিম একত্র হইয়া তাহাদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়াই কি? না, ইংরাজ কর্তৃক সর্বপ্রথমে বিজিত বঙ্গদেশ এবং ইংরাজের সর্বশেষ অধিকার পঞ্চনদ—উভয়েই উভয়ের সাহায্য চায় বলিয়া? অথবা, আপনাদের ও আমার অন্তরের একই চিন্তা ও একই আশা জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়া?

ভারতের এক বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্র আমি, আজ লাহোরে ছাত্র-দিগের মধ্যে বক্তৃতা করিতেছি, এ এক দৈবের কৌতুক! কোথা হইতে নূতন নূতন লোক এবং নব নব ভাব আজ জগতে আদর পাইতেছে বলিয়া প্রবীণেরা যে বর্তমান সময়কে দুঃসময় বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? আমার পূর্ব ইতিহাস জানিয়া যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে

আমি আজ কি বলিব, তাহা অনুমান করা আপনাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

বন্ধুগণ, পঞ্জাব ও বিশেষ ভাবে পঞ্জাবের যুবকগণের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ যদি আজ সর্বপ্রথমেই করি, আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যতীন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্য কারারুদ্ধ বাঙ্গালী দেশসেবকের জন্য তাঁহারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—বিচারে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা, প্রায়োপবেশনে সহানুভূতি, জীবিত ও মৃতাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও সম্মান—বাঙ্গালীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। শুধু তাই নয়, যতীন্দ্রের মৃতদেহ লইয়া বহু পাঞ্জাবী কলিকাতা পর্যন্তও গিয়াছেন। ভাবপ্রবণ জাতি আমরা—আপনাদের এই মহানুভবতা আমাদিগের ও আপনাদের মধ্যে এক অনির্বচনীয় সখ্যতা আনিয়া দিয়াছে। ঘোর দুর্দিনে একদিন পঞ্জাব বাঙ্গলার যে উপকার করিয়াছে, বাঙ্গালী তাহা বিস্মৃত হইবে না।

যতীন্দ্রের উল্লেখ করিয়া কলিকাতায় একদিন আপনাদের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ আলম কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যতীন্দ্রের জীবন ও মৃত্যু যেন সূর্য ও চন্দ্রের বিপরীত গতির মত: জীবিতাবস্থায় কলিকাতা হইতে লাহোরে এবং মৃত্যুর পর লাহোর হইতে কলিকাতায়। মৃত্যুহত তাঁহার দেহ একটা নশ্বর মাংসপিণ্ডরূপে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই—আসিয়াছিল পবিত্র, মহৎ ও স্বর্গীয় একটা ভাবের প্রতীক হিসাবে। যতীন মরে নাই—ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের পথ নির্দেশ করিবার জন্য সে আকাশের তারকার মত উজ্জ্বল হইয়া জাতির জীবনে বাঁচিয়া আছে, তাহার আত্মত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়া সে অমর হইয়া আছে। ভাবমূর্তির মধ্যে, আদর্শের মধ্যে,—মানুষের ইতিহাসে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু পবিত্র,—তাহার মধ্যে সে দীপ্ত ভাস্কর হইয়া বিরাজ করিতেছে। আপনাকে বিসর্জন দিয়া সে যে শুধু ভারতবর্ষের আত্মাটিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাই নয়, দুইটি প্রদেশকে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছে।

যতই আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার নবপ্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ততই আমাদের দুঃখবেদনার পাত্র পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। নিজেদের হাত হইতে রাজশক্তি প্রতিদিন অপসারিত হইতেছে দেখিয়া নির্দয় হইয়া উঠা আমাদের শাসকদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর, যদি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ভাণ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া তাহারা অত্যাচারের ভীষণ স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। পঞ্জাব ও বাংলা দেশের উপরে আজকাল সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করা হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহা আনন্দের বিষয়; কারণ, এই অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছি। ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের মত বীরদের প্রাণ-শক্তিকে কখনও দমিত করিয়া রাখা যায় না; বরং অত্যাচার ও দুঃখের মধ্য দিয়াই বীরের উদ্ভব হয়। তাই অত্যাচারকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে এবং তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে।

আপনারা হয়ত জানেন না, বাঙ্গলা সাহিত্য পঞ্জাবের প্রাচীন ইতিহাসের কত ঘটনার বর্ণনা করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং পাঠকদের জ্ঞান বাড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত কবিই আপনাদের বীরগণের যশোগাথা গাহিয়াছেন। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তাঁহারা সুপরিচিত। আপনাদের সাধুসন্তানগণের উপদেশাবলী আমাদের ভাষায় সুপ্রচলিত এবং বাঙ্গালীকেই সান্ত্বনা ও শান্তি দিয়া থাকে। শুধু মানসিক যোগ নয়—রাজনীতিক দিক দিয়াও আমরা পরস্পর সংযুক্ত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, দূর ব্রহ্মদেশের কারাগারে এবং আন্দামান দ্বীপেও বাঙ্গলার স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদের সঙ্গে পঞ্জাবের যাত্রীদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

বন্ধুগণ, যদি এই বক্তৃতায় আমি বহুলভাবে রাজনীতির আলোচনা করি, তাহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ আমি দিতে চাহি না। এদেশের এক শ্রেণীর লোক—তাহার মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকও আছেন—মনে করেন যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতি নিরর্থক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নহে। আমার নিজের দৃঢ় মত এই যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতির অনুশীলন ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নাই। পরাধীন দেশে যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজনীতি। দেশবন্ধু বলিতেন, জীবন একটা অখণ্ড সমগ্র সত্য —কাজেই রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বা এই উভয়ের ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা সম্ভব নহে। মানুষের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায় না। জাতির জীবনের প্রত্যেকটি প্রকাশ পরস্পর সম্বন্ধ এবং প্রত্যেক সমস্যাই পরস্পর গ্রথিত। ইহা ছাড়া যদি সত্য হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পরাধীন জাতির সকল অন্যায়, সকল ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ একটি মাত্র—রাজনৈতিক দাসত্ব। সুতরাং যে সমস্যার প্রতি ছাত্রেরা কোনক্রমেই উদাসীন হইতে পারে না, তাহা হইতেছে এই—কেমন করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন।

সকল রকমের জাতীয় কর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী না করিয়া বিশেষভাবে রাজ-নীতির অনুশীলনকে কেন নিষেধ করা হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয় কর্ম-মাত্রের উপরেই নিষেধাজ্ঞার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু কেবল রাজনীতির সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই যদি মূলতঃ রাজনৈতিক হয়, তবে জাতীয় কাজমাত্রেই রাজনৈতিক কাজ। কোনও স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ নয়—বরং সেখানে ছাত্রদিগকে এ কাজে উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ, ছাত্রদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যতের মনীষী ও রাষ্ট্রবিদ্‌গণের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যদি রাষ্ট্রীয় কর্মে যোগদান না করে, তবে কর্মীই বা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে এবং তাহাদের শিক্ষাই বা হইবে কোথায়? তারপর ইহা দ্বারা যে চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "কর্মবিহীন বিজন সাধনা"-য় কখনও চরিত্রগঠন হয় না, তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও কলাবিষয়ক কাজে নিয়োজিত থাকা অতি আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবলমাত্র গ্রন্থকীট, ভালছেলে ও আপিসের কেরাণী গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া চলা উচিত নহে—তাহাদের উচিত, এমন সব যুবক গড়িয়া তোলা, যাহারা জীবনের সকল দিকেই দেশের জন্য সম্মান অর্জন করিয়া যশস্বী হইবে।

বর্তমান কালের একটা সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি এই যে, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই একটা সত্যকার ছাত্র-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনকে আমি ব্যাপকতর যৌবন-আন্দোলনের একটি অংশ বলিয়া মনে করি। কারণ আজকালকার ছাত্র-সম্মিলনী এবং দশ বৎসর পূর্বের ছাত্রসম্মিলনীর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সে সময়কার ছাত্র-সম্মিলনগুলি সাধারণতঃ সরকারের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহার প্রবেশদ্বারেই লিখিত থাকিত—"রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ।" একদিক দিয়া, সেই সকল সম্মিলনীর পূর্বকালের কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে —সেখানে প্রথম প্রস্তাবেই রাজার প্রতি আনুগত্য জানান হইত। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসে ও ছাত্র আন্দোলনে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আজ আমাদের চিন্তা ও আলোচনার পথ অনেক বেশী মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

আজিকার ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটি লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম যে-সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করিয়া

দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান, ইহা তাঁহাদের আন্দোলন। ইহার দুইটি কর্মধারা আছে অথবা থাকা উচিত। প্রথমতঃ যে-সব সমস্যা বিশেষভাবে ছাত্রদিগের নিজস্ব, তাহার সমাধানের চেষ্টা করা এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক্ দিয়া একটি নবজীবন আনয়ন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা ভবিষ্যতের দেশবাসী একথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং সংসারে যে সকল সমস্যা ও বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার পূর্বাভাস এখন হইতেই তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন।

আজকালকার যৌবন-আন্দোলনের বিশেষত্ব হইতেছে—একটা চঞ্চলতার ভাব, বর্তমান অবস্থার প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা এবং নূতনতর ও উৎকৃষ্টতর মানবসমাজ স্থাপনা করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভরের ভাব এই আন্দোলনের মূলে নিহিত। যৌবন আজ আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ঘাড়ে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় না। তাহারা মনে-প্রাণে অনুভব করে যে দেশ এবং দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরেই নির্ভর করে, তাই সে দায়িত্বটিকে তাহারা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা রক্ষা করিবার উপযোগী হইবার সাধনা করে। যৌবন-আন্দোলনের অংশীভূত এই ছাত্র-আন্দোলন এক ভাব ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

যে দুইটি কর্মধারার নির্দেশ আমি করিয়াছি, তাহার প্রথমটি হয়ত সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পড়িতে না পারে, কিন্তু অপরটি নিষিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা বেশী। প্রথমটির দিক দিয়া আপনারা কি করিবেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত বা বাঞ্ছনীয় হইবে না। আপনাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ও সে সকল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকর্তারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। প্রত্যেক ছাত্রেরই শক্তি ও স্বাস্থ্য, উন্নত চরিত্র, জ্ঞানবত্তা এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আদর্শ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি শিক্ষাকর্তাদের ব্যবস্থায় এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, তবে আপনাদিগকেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে যদি তাঁহাদের ও গুরুজনদের উৎসাহ পান, তবে তো ভালই; যদি তাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করেন—তবে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনার পথে অগ্রসর হউন। আপনাদের জীবন আপনাদেরই—এবং তাহার উৎকর্ষের দায়িত্বও শেষ পর্যন্ত আপনাদেরই।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমি বলিতে চাই। আমার মনে হয়, ছাত্রসংঘগুলি এক একটি যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার (Co-operative Swadeshi Store) খুলিয়া ছাত্রদের বহু উপকার করিতে পারেন। ছাত্রেরা যদি সুচারুভাবে এই সকল ভাণ্ডার চালাইতে পারেন, তাহা হইলে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। একদিকে ছাত্রেরা অল্প মূল্যে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বহু গৃহশিল্পের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে। অপর দিকে, যৌথ কারবারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া লভ্যাংশ ছাত্র-সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা যাইবে।

ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ব্যায়াম সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনাসমিতি, মাসিক পত্র পরিচালনা, সঙ্গীত সমাজ, পাঠাগার, সমাজকল্যাণ-সংঘ ইত্যাদি স্থাপনা করিতে হইবে।

অপর দিকটি সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। সে হইতেছে ভবিষ্যতের দেশবাসী হইবার শিক্ষা গ্রহণ। এই শিক্ষা চিন্তা ও কার্য উভয় দিক্ দিয়াই হইবে। ছাত্রদিগের চক্ষের সম্মুখে এমন একটি আদর্শ নরসমাজের চিত্র ধরিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ঐ আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এই সঙ্গে

এমন একটি কর্মতালিকা তাহাদিগকে দিতে হইবে, যাহাকে তাহারা যতদূর সম্ভব পালন করিবে। এই কর্মে তাহারা হয়ত কর্তাদের নিকটে অনেক বাধা পাইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরোধ ঘটে, তবে ছাত্রদের পক্ষে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া চিন্তায় ও কর্মে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

যে আদর্শকে আমরা সযত্নে পোষণ করিব, তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমি একটি কথা বলিতে চাই। ইউরোপের পদানত শৃঙ্খলিত এশিয়ার অবস্থা প্রত্যেক এশিয়াবাসীরই মনে দুঃখ ও অপমান বহিয়া আনে। কিন্তু একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে যে, এশিয়ার অবস্থা চিরদিনই এরূপ ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে এশিয়া ইউরোপের বহু অংশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সে দিন ইউরোপ এশিয়ার নামে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্তন হয়ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিরাশার কারণ কিছুই নাই। আজ এশিয়া তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের উদ্যোগ করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন শক্তি ও গৌরবে ভাস্বর হইয়া স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিবে।

পাশ্চাত্ত্যের ব্যস্তবাগীশগণ কখনও কখনও এই প্রাচীন প্রাচ্যকে "অপরিবর্তনশীল" বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে—যেমন কিছুদিন পূর্বেও তাহারা তুরস্ককে "ইউরোপের অসুস্থ জাতি" বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এই নিন্দা এশিয়া বা তুরস্ক কাহারও পক্ষে সত্য নয়। সমস্ত প্রাচ্যদেশ আজ নব জাগরণের বিপুল শক্তিতে টলমল। সর্বত্রই পরিবর্তন, উন্নতি এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। যতদিন ইচ্ছা প্রাচ্য অবশ্য অপরিবর্তনশীল থাকিতে পারে, কিন্তু একবার পরিবর্তন আরম্ভ করিলে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের বহু সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। আজ এশিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে।

মাঝে মাঝে কেহ প্রশ্ন করেন—আজ এশিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য দেখিতেছি, তাহা কি সত্য সত্যই জীবনের চিহ্ন, না বাহিরের উত্তেজনার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র? আমি মনে করি, নব নব সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ। যখন দেখিতে পাই যে, বর্তমান আন্দোলন একটা নূতন পথ কাটিয়া নব নব সৃষ্টির উদ্যমপূর্ণ বেগে চলিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে, সত্য সত্যই জাতির নবজাগরণ আসিয়াছে, এবং ইহা সত্য সত্যই অন্তরের মধ্য দিয়া পুনঃ চেতনার গভীর আলোড়ন।

ভারতবর্ষে আজ আমরা একটা ভাবধারার ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে রহিয়াছি। তাহার চারিদিক দিয়া বহু অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই তুমুল মিশ্রণের অব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ লোক ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ ধরিতে পারে না। কিন্তু আজ যদি আমাদিগকে জাতির লুপ্ত শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া লক্ষ্যপথে চালাইতে হয়, তবে আমাদের লক্ষ্য কি এবং কেমন করিয়া সে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে।

একটা তিমির-যুগ পার হইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ নবজীবনের পথে চলিয়াছে। ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মত এই সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে কি না, একদিন সেই ভাবনা ছিল, কিন্তু আবার তাহা কালের অত্যাচার কাটাইয়া উঠিয়াছে। আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে চিন্তাজগতে একটা ভাব-বিপ্লব আনিতে হইবে এবং জীবজগতে নব-রক্তের সংমিশ্রণ করিতে হইবে। ইতিহাসের এবং মনীষিগণের মত মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই এক উপায়েই প্রাচীন জীর্ণ সমাজকে শক্তিমান্ করিয়া তোলা সম্ভব। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে

আপনারা সভ্যতার উত্থান-পতনের নিয়মটি নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করুন। এই নিয়মটি আবিষ্কার করিতে পারিলেই আমরা দেশবাসীকে পরামর্শ দিতে পারিব, উন্নতিশীল, শক্তিধর জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে কি পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

ভাবজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটি আদর্শকে চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে হইবে, যাহা বিদ্যুতের মত আমাদের শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলবে। সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সকলে এক বুঝেন না; আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের একটা ক্রমপরিবর্তন হইতেছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা, শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন-মুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমানবিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জনও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারিবে।

জাতীয় জীবনের যত দিক দিয়া প্রকাশ হইতে পারে স্বাধীনতার আংশিক রূপ ততগুলিই। কেহ কেহ স্বাধীনতা বলিতে স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের কথাই বুঝেন। স্বাধীনতার এই সংকীর্ণ সংজ্ঞাটিকে কাটাইয়া উঠিয়া ব্যাপক অর্থটি গ্রহণ করিতে আমাদের বহু বৎসর লাগিয়াছে। যদি স্বার্থের মুখ না চাহিয়া স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে আমরা ভালবাসিতে চাই, তাহা হইলে একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবল মাত্র ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য ও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এযুগের আদর্শ তাহাই—সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা অনুভব করা। অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাউক এবং স্বাধীনতার মদিরপ্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় বহিয়া যাউক। স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখন কর্মের একটা অশ্রান্ত প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে বহিয়া যাইবে। ভীরুর সাবধান বাণী তখন আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না—সত্য ও কর্মের আহ্বান আমাদিগকে তখন লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

বন্ধুগণ, জীবনের লক্ষ্য হিসাবে আমি যাহা চিন্তা ও অনুভব করি এবং যাহা আমার সকল কর্মের পশ্চাতে ইঙ্গিত স্বরূপ রহিয়াছে, সেই আদর্শের কথা আপনাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনাদিগের মনে ইহা ভাল লাগিবে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে, জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের মূল সুর—সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিই তো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। আপনাদের নিজেদের প্রাণে এবং দেশবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটি জাগাইয়া তুলুন—তাহা হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন আসিবেই, তেমনি ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কোনও শক্তি এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু আসুন, এমন মহীয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি, যাহার জন্য জীবন-সর্বস্বধন বলি দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি। আমি ভারতবর্ষের যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিবাণী জগতের কাছে দিকে দিকে ঘোষণা করুক।

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি রূপেই ভারতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে। এই হীনতা ও পরাধীনতার মধ্যেও তাহার দান বড় নগণ্য নয়। আপনার প্রয়োজন মত আপনার পথে চলিবার স্বাধীনতা পাইলে সে-দান কত বৃহৎ ও মূল্যবান হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও হয়ত স্বাধীনতার এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার অসামর্থ্য অবশ্যই দুঃখের বিষয়; কিন্তু সত্য, ন্যায় ও সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শকে আমরা এখনই ত্যাগ করিতে পারি না। অপর কেহ আমাদিগের সঙ্গে যদি যোগ না দেয় তবে আমাদিগকে একাই চলিতে হইবে—কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, লক্ষ লক্ষ লোক এই স্বাধীনতার পথ-যাত্রায় যোগ দিবে। বন্ধন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে যুদ্ধের বিরতি হইতেই পারে না।

দেশের সকল স্বাধীনতাকামীরই সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার সৈনিক শ্রেণী গঠন করিবার সময় আসিয়াছে।

ইহারা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবে না—স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবার জন্যও দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিবে। আপনাদের মধ্য হইতে এই প্রচারক ও সৈন্য দলের সৃষ্টি করিতে হইবে। বিস্তৃত ও অন্তর্ব্যাপী (intensive) প্রচার ও দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমাদের প্রচারকগণ চাষী ও কারখানার মজুরদের মধ্যে গিয়া নব বাণীর প্রচার করিবে। তাহারা যুবকদের এবং তাহাদের সংঘগুলিকে অনুপ্রাণিত করিবে। পরিশেষে তাহারা দেশের সমগ্র নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে—কারণ, আজ নারীকে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার লইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দলভুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জাতীয় কংগ্রেসই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতির সকল আশা ভরসা ইহার উপর ন্যস্ত। কিন্তু শক্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার শ্রমিক আন্দোলন, যৌবন আন্দোলন, চাষী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের উপরে নির্ভর করিতে হয় এবং আমার মতে, করা উচিত। যদি আমরা শ্রমিক, চাষী, তথা-কথিত নিম্নজাতি, যুবকবৃন্দ, ছাত্রগণ ও নারীদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, তবে কংগ্রেস অসীম শক্তিমান হইয়া দেশের মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে। সুতরাং, যদি আপনারা সার্থকভাবে কংগ্রেসের সেবা করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই সকল আন্দোলনকেও আপনাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের ঘরের পাশেই চীনদেশ—তাহার ইতিহাসের একটি যুগ পর্যবেক্ষণ করুন—দেখিতে পাইবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রেরা কি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করিতে পারি না? আধুনিক চীনের নবজাগরণ তো ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। একদিকে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে কারখানায় গিয়া স্বাধীনতার নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে তাঁহারা সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। স্বাধীনতার কোনও সহজ নির্বিঘ্ন পথ নাই। স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত-বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে।

স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সেই উদ্যমে জীবনপাত করিয়া আমরা মৃত্যুজয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার উপযুক্ত হই। বন্দে মাতরম্।*

*বিগত ১৯শে অক্টোবর লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ। ইংরেজী হইতে অনূদিত।

॥ চার ॥

"এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতি-গঠন করিতে হইবে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিন বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে।"

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের ছাত্রগণের এই সম্মিলনে যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আজ আমি মনে মনে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইহা কেবল আনন্দের বিষয় নহে, এরূপ ছাত্র সম্মিলনে যোগদান করিতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য —ইহাও বলিতে হইবে। আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যই আমি একথা বলিতেছি না—ইহা বাস্তবিকই আমার মনের কথা। ইহাতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। কারণ, প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিলেই যেন আমার চিত্তবৃত্তির স্বতঃ বিকাশ হয়, সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়া যায় এবং আমি আমার প্রাণের কথা অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া বাহির হইবার পর প্রায় দশ বৎসর আমার কাটিয়া গিয়াছে। এখনও কিন্তু আমি নিজেকে ছাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তবে আমার এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আপনাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে একটু বড় এবং ব্যাপক। ইহাকে "জীবনের বিশ্ব-বিদ্যালয়" বলিলেই ঠিক হয়। আমি এখন জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত, নিত্য নূতন উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করাই আমার বর্তমান কাজ। তথাপি আমার মনে হয়, ছাত্র-জীবনের আদর্শবাদ, কল্পনা ও ভাবুকতা একেবারে আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই। সুতরাং আমার পক্ষে আপনাদের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার কথা উপলব্ধি করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না।

তথাপি আমার একটা সন্দেহ আছে—তাহা এই যে, ছাত্র সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্যতা আদৌ আমার আছে কিনা? কারণ, ছাত্র-জীবনের "সচ্চরিত্রতার" দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, আমার নিজের ছাত্রজীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। এখনও সেদিনের কথা আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, যেদিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া আমার উপর দণ্ডাদেশ জারী করিয়াছিলেন, কলেজ হইতে আমাকে সাস্‌পেণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন "কলেজের মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা দুরন্ত ছেলে।"

আমার জীবনের সেইটি একটি স্মরণীয় দিন। বলিতে গেলে, নানা দিক দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সেদিন-ই আমি সর্বপ্রথম অনুভব করিলাম—কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে নির্যাতন সহ্য করার মধ্যে একটা বিমল আনন্দ আছে। এই আনন্দের সহিত জীবনের আর কোন আমোদ প্রমোদেরই তুলনা হয় না। আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। ইতিপূর্বেই আমি আদর্শের মধ্য দিয়া নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু সেইদিনই সর্বপ্রথম এই সমস্তের পরীক্ষা—শুধু পরীক্ষা নয়, অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। এই গুরুতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি দেখিলাম—আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ও

কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে, এই লোকটা বড়ই অদ্ভুত। কোথায় আমাদের কথা আলোচনা করিবে,—না তাহার পরিবর্তে সে নিজের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি এখানে কেন আসিয়াছি? আমার উদ্দেশ্য কি, তাহা আপনারা স্থির করিয়াছেন কি? নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা করিতে আমি এখানে আসি নাই; আমি আসিয়াছি আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি জ্ঞানের কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে। একথা কি সত্য নহে যে, কেবল সেই উপদেশেরই মূল্য আছে, যে উপদেশ প্রকৃত পক্ষে নির্যাতন ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে?

ভারতের সর্বত্র আজ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের সংঘাত বাধিয়াছে। বহুসংখ্যক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারমূলক—বর্তমান অবস্থায় সংস্কার সাধনই তাহাদের লক্ষ্য। অপর কতকগুলি হইতেছে নির্মূলকারী—বর্তমান অবস্থার অবসান করিয়া নূতনের জন্মদান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত হট্টগোলের মধ্যেই আজ নূতন ভারতের জন্ম হইতেছে। এ সময়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাবী উন্নতি-অবনতির গতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহারা তরুণ, যাহাদের আদর্শ অতি মহান্ এবং অতিশয় উচ্চ, যাহাদের আত্মসংবিৎ অতি প্রখর, সমগ্র জাতির ভাবধারার সহিত যাহারা নিজের ভাবধারা মিলাইয়া দিতে সমর্থ, যাহাদের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছে—কেবল তাহারাই এ কাজের উপযুক্ত। কেবল তাহারাই এ সময়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নির্দেশ করিতে পারে।

ভারতে এখন যে সমস্ত আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহাদের কথা একে একে বিশ্লেষণ করিতে হইলে এবং প্রত্যেকটির বিষয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হইলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন,—এক দিনের বক্তৃতায় তাহা শেষ হইবে না। আমি তাই আজ সে চেষ্টা করিব না। তবে একটা কথা আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই,—তাহা এই যে, এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, সামাজিকতা ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে যে জিনিষের যে মূল্য আমরা এখন দিয়া থাকি, আবার নূতন করিয়া নূতনভাবে তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

বিশেষ অভিনিবেশের দরকার নাই—দূর হইতে সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলেও একটা কথা ধরা পড়ে। তাহা এই যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ আন্দোলনই তেমন দূর-প্রসারী নহে; এগুলির প্রায় প্রত্যেকটি একান্ত অগভীর। ইহারা সমগ্র জাতির অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে নাই,—কেবল আমাদের সমাজ ও জাতির বাহ্যিক অভাব-অভিযোগের এক-আধটু স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। এ সমস্ত আন্দোলন দ্বারা যে কোন কাজই হয় না বা হইতে পারে না—একথা বলিতেছি না। ইহার দ্বারা খুব সামান্য কাজই হইতে পারে। মোটের উপর সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে এরূপ অগভীর আন্দোলন দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না, হইতে পারে না। আমরা চাই—জাতীয় জাগরণ, বাহ্যিক নহে—আন্তরিক জাগরণ। সমগ্র জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইতে হইবে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভবপর—ইহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান চাই।

আমাদের এই দেশ বড়ই প্রাচীন। আমাদের এই সভ্যতাও খুবই পুরাতন; ইহাতে

অভিভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও আজ পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে বীরের মত অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি। সময় সময় ইহাতে অভিভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও আজ পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে একেবারে নির্মূল হই নাই। কখনও যদি আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া থাকি তবে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আজ আমরা অবসন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু হয় নাই। চিন্তায় ও কার্যে মৌলিকতা এবং সৃজনী শক্তিই জীবনের লক্ষণ। এই সমস্ত বিষয়ে জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে গৌরব করিবার যথেষ্ট অধিকার আমাদের আছে। আমরা যদি বাঁচিয়া না থাকিতাম তাহা হইলে জাতীয় জাগরণের সমস্ত আশাই বিফল হইত। আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের সমস্ত উপাদানই আমাদের রহিয়াছে। সেইজন্যই আজও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছি।

অন্তরের দিক হইতে যে জাগরণ—সেই জাগরণই আমরা চাই। কেবল তাহাতেই আমাদের এই জীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। এখানে সেখানে এক-আধটু সংস্কার দ্বারা কাজ হইবে না, বাহ্যিক প্রলেপ কার্যকরী হইবে না। সম্পূর্ণ পরিবর্তন, সম্পূর্ণ নূতন জীবন পরিগ্রহণই আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন। ইহাকে ইচ্ছা করিলে "সম্পূর্ণ বিপ্লব" আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

"বিপ্লব" এই কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। তবে এ পর্যন্ত আমি এমন লোক একটিও দেখি নাই—যে কখনও বিপ্লবের কথায় বিশ্বাস করে না! মোটের উপর বিবর্তন (Evolution) এবং বিপ্লব (Revolution) এই দুইয়ের মধ্যে কোন মজ্জাগত প্রভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে বিবর্তন (Evolution) সম্পন্ন হয় তাহাই বিপ্লব (Revolution); পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে বিপ্লব সম্পন্ন হয় তাহাই বিবর্তন। বিবর্তন ও বিপ্লব এই উভয়েরই গোড়ার কথা হইল পরিবর্তন। এই জগতে উভয়েরই স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্যে কোনটিকেই একেবারে বাদ দিয়া চলা যায় না।

আমি বলিয়াছি যে, ভালমন্দ সম্পর্কে এখনও আমাদের যে সমস্ত ধারণা আছে তাহার অনেকগুলিরই পরিবর্তন করিতে হইবে। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, আমাদের বর্তমান গতানুগতিক জীবনের একটা আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। জাতি হিসাবে বড় হইতে হইলে এবং জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে গৌরবের আসন অধিকার করিতে হইলে ইহাই আমাদের একমাত্র পথ। সেই জীবনেরই একমাত্র সার্থকতা আছে, মূল্য আছে এবং অর্থ আছে—যে জীবনের সম্মুখে একটা বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ রহিয়াছে। যে জাতি উন্নতি করিতে চায় না, বিশ্বসভায় বিশেষত্ব লাভ করিতে চায় না, সে জাতির পক্ষে বাঁচিবার কোনই প্রয়োজন নাই—এমন কি বাঁচিবার কোন অধিকারই তাহার নাই। আমি এ কথা বলি না যে, কোনও স্বার্থগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এক একটা জাতির পক্ষে উন্নতির চেষ্টা করা দরকার। সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে। যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্বজগৎ মানব জাতির বসবাসের পক্ষে অধিকতর সুখকর কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা জাতিকে উন্নতিশীল করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় তৎসমস্ত উপাদানই ভারতের আছে। কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক কোনও রূপ উপাদানেরই অভাব এখানে নাই। ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন তাহা এখনও নির্ধারিত

হয় নাই; তথাপি সে মরে নাই; এখনও ভারতবর্ষ জীবিত আছে। কেন সে বাঁচিয়া আছে? তাহাকে আবার মহান হইতে হইবে, আবার তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। জগতকে মহত্তর ও বৃহত্তর কিছু দান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে।

ভারতের লক্ষ্য কি? তাহার কর্তব্য কি? প্রথমতঃ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে এবং তারপর জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু দান করিতে হইবে। অর্ধশতাধিক অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ আজ যাহা দিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। এখন একবার কল্পনা করুন দেখি, ভারতবর্ষ যদি তাহার নিজ অভিপ্রায় অনুসারে, নির্বাধে ও স্বাধীনভাবে নিজেকে বিকশিত করিতে পারিত তাহা হইলে মানব জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার দান আরও কত বেশী হইত?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এ জাতির মধ্যে অক্লান্ত কর্মপ্রেরণা জাগাইতে পারিলে ভারতবর্ষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে চমৎকৃত করিতে পারে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, একবার এই ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা ভংগ হইলে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতি সমূহকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। আজ আমাদের এই যাদুকরের দণ্ডেরই প্রয়োজন—যে দণ্ড সঞ্চালনে আমাদের সমাজের সর্বত্র সাজ সাজ রব উঠিবে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসন "elan vital" অর্থাৎ প্রেরণাদায়িনী শক্তির কথা বলিয়াছেন। এই শক্তিই সমগ্র জগতকে কর্মের পথে, উন্নতির পথে সঞ্চালিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণাদায়িনী শক্তি কি? স্বাধীনতার জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ—তাহাই এই প্রেরণাদায়িনী শক্তি। আত্ম-বিকাশের এই যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহার অপর দিকই হইল বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আপনারা যদি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদের চতুর্দিকে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এই বিদ্রোহ যদি সার্থক হয় তাহা হইলে আপনাদের স্বাধীনতালাভ অবশ্যম্ভাবী।

আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইহারা ছাড়া আর সকলেই দাসত্বের জ্বালা ও অপমান কিছু না কিছু অনুভব করেন। এই অনুভূতি যখন প্রখর হইয়া উঠে তখন দাসত্বের বন্ধন আর সহ্য হয় না; মানুষ তখন এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সে কোন-না-কোন উপায়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীন দেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা কিম্বা স্বাধীন আবহাওয়া হইতে উৎপন্ন সুখকর অবস্থার কথা পাঠ ও কল্পনা দ্বারা সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া থাকে! দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই তপস্যা কি? জাতীয় অপমান এবং বর্ণগত বৈষম্য প্রভৃতির অনুভূতি প্রখর হইতে প্রখরতর করিতে হইবে, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আগ্রহ তাহাকে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে এই তপস্যারই প্রয়োজন। ইতিহাস পাঠ করিয়া, আমাদের বর্তমান অবনতি লক্ষ্য করিয়া, জীবনের আদর্শের কথা অনুধ্যান করিয়া এবং সর্বোপরি স্বাধীন দেশের অবস্থার সহিত পরাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিয়াই আমরা জাতীয় মুক্তির জন্য প্রেরণা লাভ করিতে পারি।

আমি মনে করি—Baptism, Initiation ও দীক্ষা প্রভৃতির একটি মাত্র মানে হয়; তাহা এই যে, স্বাধীনতার বেদীতে জীবন উৎসর্গ করা। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ এক দিনে সম্ভবপর হইবে না। আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য ব্যকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ততই বুঝিতে পারিব যে জীবনের একটা মহান্ অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

তখনই বিপ্লব উপস্থিত হইবে—আমাদের চিন্তা, আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই সমস্তই তখন পরিবর্তিত হইয়া নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। তখন আমাদের নিকট কেবল একটি জিনিষই মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে; আমরা কেবলই স্বাধীনতারই উপাসনা করিব। আমাদের মনোবৃত্তিও তখন পরিবর্তিত হইবে এবং সেই আদর্শেরই অনুগামী হইবে। এই ক্রমিক পরিবর্তনের অনুভূতি যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই পরিবর্তন যখন সম্পূর্ণ হইবে তখন আমাদের পুনর্জন্ম হইবে; আমরা তখন প্রকৃত "দ্বিজ" হইব। অতঃপর আমরা কেবল স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিব, স্বাধীনতার স্বাদ-ই উপলব্ধি করিব এবং স্বাধীনতার কাহিনী-ই স্বপ্নে দেখিব। আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মধ্য দিয়া তখন একটি মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে—সেইটি হইবে স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তখন স্বাধীনতার নেশায় মত্ত হইব—স্বাধীনতাই তখন আমাদের জীবনের সর্বস্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাণের মধ্যে একবার স্বাধীনতা লাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে ইহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত শক্তি—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সমূহ, নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা যে সমস্ত বিষয় শিখিয়াছি তাহার অনেকটা ভুলিতে হইবে এবং যাহা কখনও আমাদিগকে শিখানো হয় নাই এমন অনেক বিষয় আমাদিগকে সর্ব-প্রথম শিক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের গুরু কর্তব্যভার বহন করিবার জন্য শরীর ও মনকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে, আমাদের জীবনের বাহ্যিক আবরণ দূর করিতে হইবে, বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদ বর্জন করিতে হইবে। পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং নূতন জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবন পরিপূর্ণ এবং পবিত্র হইয়া স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিবে।

মোটের উপর মানুষ একটা সামাজিক জীব। সমাজের অবশিষ্ট অংশ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আত্মবিকাশ হইতে পারে না। জীবনের সর্বাংগীণ উন্নতি, পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে বহুল পরিমাণে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। তারপর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র সমাজের উন্নতি না হইলে একমাত্র ব্যক্তির উন্নতি দ্বারা বিশেষ ফল হয় না; এরূপ ব্যক্তিগত উন্নতির খুব বেশী মূল্য থাকে না। যোগী সন্ন্যাসীর যে আদর্শ তাহা আমাদের সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। সামাজিক জীবনের মধ্যে যাহার স্থান নাই, সে আদর্শের খুব বেশী মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং স্বাধীনতাকেই যদি আমাদের জীবনের মূল-নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, ইহাকেই যদি আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার প্রেরণাদায়িনী শক্তি বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজ সংস্কারের ভিত্তিও এই স্বাধীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই স্বাধীনতার নীতি মোটের উপর সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমগ্র সমাজের জন্য স্বাধীনতা বলিতে নারী ও পুরুষ—এই উভয়েরই স্বাধীনতা বুঝিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—কেবল উচ্চ শ্রেণী নয়, অনুন্নত শ্রেণীকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, সকল সম্প্রদায়, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ সমাজ এবং সকল শ্রেণী ও সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই

ভ্রাতৃত্ব।

সমাজের বন্ধন মুক্ত করিতে হইলে সামাজিক ব্যাপার এবং আইনসঙ্গত বিষয়ে মহিলাদিগকে সমান অধিকার দিতে হইবে। যে সামাজিক বিধান দ্বারা, নিম্নবংশে জন্মগ্রহণের জন্য, কোন কোন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে সেই বিধান নির্মমভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের পদমর্যাদার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা দূর করিতে হইবে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সামাজিক উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তৎসমস্তই বর্জন করিতে হইবে। প্রত্যেককে শিক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য সমান সুযোগ দিতে হইবে। যুবককে যুবক বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সমাজ-সংস্কার এবং দেশ শাসনের ভার যুবক ও যুবতীদের উপরেই ন্যস্ত হইবে। সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে—সর্বত্র এবং সর্ব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে —ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না। আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই, সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে—সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত আমার এই কল্পনাকে আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে করিতে-ছেন। কেহ কেহ হয়ত ভাবিতেছেন—আমি একজন স্বপ্ন-বিলাসী; বাস্তব জগতের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। যদি ইহাই আপনাদের মনে হয়, তাহা হইলে আমি নাচার; দোষ স্বীকার ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আমি নিজেকে স্বপ্ন-বিলাসী বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তবে আমি এই স্বপ্নই ভালবাসি। আমার নিকট কিন্তু এই সমস্ত স্বপ্নই কঠোর বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বপ্ন হইতেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, কাজ করিবার শক্তি আমার প্রাণে জাগে। এই সমস্ত স্বপ্ন না থাকিলে আমার পক্ষে জীবনধারণ করাই অসম্ভব; কারণ তাহা হইলে জীবনের আর কোন মাধুর্যই থাকে না। এই সমস্ত স্বপ্ন ছাড়া সমগ্র জীবনটাই আমার নিকট ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়।

আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি—সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন; আপনার সভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই—এই ভারত তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক; তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাহারই হস্তগত হউক। আমি চাই—এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমানপোত, তাহার সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক; আমি চাই—পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক। আমি দেখতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারতমাতা, সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়ৈশ্বর্যশালিনীরূপে দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই —এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।

ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ আপনারা ছাত্র হইলেও আপনারাই জাতির ভবিষ্যৎ আশা, ভারতের মঙ্গল। এদেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আপনারাই স্বাধীন ভারতের ভাবী বংশধর হইতে চলিয়াছেন। আমি তাই আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করি—আপনারা আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নাবলীর কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করুন। ইহা ছাড়া আমার আর কিছু-ই নাই; আর কিছুই আমি আপনাদিগকে দান করিতে পারি না। আমার এই দান আপনারা গ্রহণ করিবেন কি? আপনারা বয়সে তরুণ, আপনাদের হৃদয় আশায় ভরপুর। আপনাদের সম্মুখেই বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের স্থান হওয়া উচিত। এই আদর্শ যতই উচ্চতর হইবে ততই আপনাদের সুপ্ত

শক্তি জাগ্রত হইবে। অতএব হে ছাত্রগণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষানবিশী করাই কেবল ছাত্র-জীবনের কর্তব্য নহে; তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ছাত্র-জীবনের কর্তব্য। কারণ, কেবল অন্নবস্ত্র পাইলেই মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমি আপনাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছি। এই অনাগত যুগের জন্য আপনাদিগকে কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে, কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে এবং নির্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া আপনাদের দেহ ও মনকে গঠন করিতে হইবে। আপনাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই এই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আমি যে জীবনের চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহাতে দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন আসিতে পারে—একথা অস্বীকার করি না। তবে এ কথায় বিশ্বাস করুন যে, ইহাতে আনন্দও কম পাইবেন না। আমি যে পথের কথা বলিলাম তাহা কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এই পথই কি একমাত্র গৌরবের পথ নহে? আমি তাই আপনাদিগকে আহ্বান করি,—আসুন আপনারা, আমরা সকলে এক দলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করি। তাহা হইলেই আমাদের মানব-জীবন ধন্য হইবে। দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে বটে; তবে শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্যই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব, পরমানন্দ এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারিব।—বন্দে মাতরম্।*

* ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অমরাবতীতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।

যুব-আন্দোলন

"যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন-চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহত হইতে পারে না।"

পাবনা জেলার যুব-সম্মিলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কখনও হয় নাই; যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জিলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ-প্রদর্শকের কাজ করিবেন।

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন,—জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নব-সৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজি নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা নয়; ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" তখন তাঁহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম—"The voice of Krishna was the voice of immortal Youth." ধ্বংসের করাল মূর্তি দেখিয়া অর্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত

হইয়াছিলেন যে, ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না; তাই শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি? তরুণের আদর্শ—বর্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে কোন প্রতিষ্ঠান—যেমন সেবা-সমিতি, যুবক সমিতি বা তরুণ সঙ্ঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি?—লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে চায় আনিতে ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব-সৃষ্টিরূপ কার্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা।"

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের মত সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে—এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মত কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ কোন গোলমাল সৃষ্টি হয় না; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশঃ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কিতরুণেরা নব্য তুর্কিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ যখন সেনাপতিকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না—বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্মানেরা দেখিল যে, তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল; তখন জার্মানীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য, বীর্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ-সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ এই—ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার-সাধনের ভার গ্রহণ

করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞাতবশতঃ মনে করিয়া থাকেন যে, যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। শৈশব কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই, তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য—সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে—ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনও রূপটি হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য।

যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া উহা non-political নয়: রাজনীতি বর্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে, জাতীয় আন্দোলন—রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র।

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এই সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা তরুণসমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা "Ism") প্রচলিত আছে, যথা —Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism, Republicanism, Constitutional monarchy, Fascism ইত্যাদি। এক একটি "ism"-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনও কোনও দেশে "ism"-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনও "ism"-এর মতবাদের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন —man-making is my mission— মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সর্বদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে যুব-আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্রবাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা—সেই সমস্যার সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে—আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে যে ভাইয়ের সম্বন্ধ—এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনের

অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আত্মস্থ তরুণ-জাতি অনুভব করিতেছে যে সব দেশ ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলতঃ একই। বিশ্বের তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্মা-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌঁছিবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্জ্বলিত আছে তাহা যদি নির্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে যুব-আন্দোলনের খুব প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে কূট রাজনীতিবিদ্‌দের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মত। কামান বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্ম-বলিদান করিতে হইবে—অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদদলিত। যে পর্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত শান্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়—তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপন করিবে।

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ বিদেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্বদেশে ও সর্ব যুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্তর্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে করিতে পারি যে, প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে বিধির কোন বিধান নাই। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনী শক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কখনও জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনও বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মত কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান্ সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি, একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সংগমস্থলে

পরিণত হইয়াছে। হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুণই ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বক্ষে বাস করিতেছে।

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক না কেন, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে, বিভিন্ন সভ্যতার ও শিক্ষার (culture) সংঘর্ষের দরুণ চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরাজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তা-জগতে একটা বড় রকমের ওলট্-পালট্ হইয়াছিল। ইহা বর্তমান যুগের নব জাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন অবস্থার তুলনা করিয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি।

যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখিতে শিখিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই স্বপ্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একদিকে আছে অসন্তোষ, আর একদিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ।

কোন মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ism আপনি গ্রহণ করুন না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে, কার্ল মার্কসের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মার্কসের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের ধারণা আছে যে, Socialism অথবা Republicanism বুঝি বা পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism ও Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না, এমন কি বর্তমান যুগেও ভারতের কোন কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়—ইহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সংকল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশা আমি করি না। কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি না কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টিকার্য কখনও সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, বীর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি—এর কোনটির তো অভাব নাই; এ সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা করিতে পারি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন—যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ

করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শতসহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক!

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইংরাজের আছে—তাই ইংরাজ এত বড় আর আমরা এত হীন; আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, স্বজাতিকে ভালবাসি না, তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর-উমিচাঁদ। মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা, tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল—tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শক্তিপূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হ'ত তবে চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভু হ'ত না॥

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই ভাবে:

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব ভারতের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মত চলিতে শিখিব।

[শনিবার ২৭শে মাঘ, ১৩৩৫ পাবনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ দুই ॥

"সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে—একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর আর অপর দিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িতে হয় তবে একদিকে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি।"

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিয়াছি। জ্ঞানের সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতা লাভ করে—তাহাও বোধ হয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, পলিতকেশ না হইলে মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্তু এই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ-যুবক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে তুর্কী, ইটালী, চীন প্রভৃতি বহু নবজাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদের হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে. তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে সংরক্ষণেরই বেশী প্রয়োজন—যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাজ—সে ক্ষেত্রে আপনি প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিত-দন্ত পলিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের, রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি—ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদের ডাক পড়িয়াছে, যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা কাঁচা, যাহারা আপাত-দৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া।

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে youth is a crime, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মত ত্রুটি বা অপরাধ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্মণ্যতা বা অবিমৃষ্যকারিতা নয়—এ কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

আজ বয়োজ্যেষ্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যুবকেরা যদি এই সংকল্প করে যে তাহারা চরিত্রগুণে এবং সেবা ও কর্মদক্ষতার

দ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠগণের হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে?

পৃথিবীব্যাপী যে যুব-আন্দোলন বা youth movement এখন চলিতেছে—ইহার স্বরূপ কি, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কি—সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলের নাই। যুবক ও যুবতীরা সংঘবদ্ধ হইয়া যে কোনও আন্দোলন শুরু করিলে সে আন্দোলন যে "যুব-আন্দোলন" আখ্যার যোগ্য হইবে এ কথা বলা যায় না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনও বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না! বিশেষতঃ যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে—সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে—ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।

যুবকদের বর্তমান যুগে কি করা উচিত সে বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়া আমি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটি মূল কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে—একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপরদিকে, সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একদিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (social qualities) বিকাশ হইবে—এ কথা মনে করা উচিত নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজগঠন-বিরোধী) বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণস্বরূপ আমি বলিতে পারি যে, সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যে দিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল, সে দিন সমাজের ও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষ লাভই মানুষের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

আমার নিজের মনে হয় যে, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তির (anti-social quality) জন্যই আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। সংঘবদ্ধভাবে কাজ না করিতে পারার জন্য—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে—আমরা কোনও দিকে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমি চাই না যে, আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা আলোচনায় গ্রহণ করেন। আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং ঐ আলোচনা হইতে আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের চরিত্রের দোষগুলি সর্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত জাতি সে বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে।

বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য

নিয়ম নিহিত আছে—এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। পাশ্চাত্য মনীষীরা কিন্তু কোনও ঘটনাকে সহজে "আকস্মিক" বা "অদৃষ্টসম্ভূত" বা "দুর্দৈব সংঘটিত" বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। প্রত্যেক জাতির আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা ও কথা ও কার্য—এক সুরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর-বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ সূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশী জোর দিতেছি না। তার কারণ এই যে, ভারতবাসী কোনও দিনই ব্যক্তিগত সাধনা ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনও দিনই ত্যাগ করি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং আমাদের দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যে যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনও জন্মাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে, খাঁটি মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনও দিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective Sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা—সে সাধনার কোন সার্থকতা নাই। তাই সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মত আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে রুদ্রের মত বলিতে হইবে—জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তিনিচয় আমরা কুসংস্কার-জ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্মূল করিব।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে, সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্যজীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর-সাধনা করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না—মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য—এক সুরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ-সূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বর্তমান যুগে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে দেশাত্ম-বোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা এই আদর্শের অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয়; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য।

নূতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতি গতানুগতিক পন্থা বর্জন করিয়া সর্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু

আমরা যেন "অজানার" ভয়ে সর্বদা ভীত; বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালবাসি; তাই আমাদের spirit of adventure এত কম। কিন্তু এই spirit of adventure—যার এত অভাব আমাদের মধ্যে—সকল জাতির উন্নতির একটা প্রধান কারণ। আমি বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে তাই বলিতে চাই—বাহিরের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখিতে হইবে। ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশ দেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে।

আমাদের অসীম শক্তি আছে—নাই আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে; আমরা নিজেরাই অবাক্ হইব এত শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল! এই নবজাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"—এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্য সত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনও বাধাবিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ—এস আমরা এক সঙ্গে বলি—"আমরা মানুষ হব; নির্ভীক, মুক্ত, খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজরাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা আমরা মানব না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব; ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব।" এসো ভাই! আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলি—"পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ; অতএব জননী! জাগ্রহি।"

[গত ২২শে জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ তিন ॥

"সর্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহা চায় তাহা পায় না; যে আদর্শকে ভালবাসে সে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।"

আজ আপনারা মেদিনীপুর জেলায় যুব-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছেন এবং আমাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। আমিও সানন্দে আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই সম্মিলনীর আয়োজন যখন আপনারা করেন, তখন কি একবার ভাবিয়াছিলেন কেন আপনারা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের পরিবর্তে যুব-সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন? আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে—যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন? ইহার কারণ নির্দেশ করা খুবই সহজ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর বীতশ্রদ্ধ ভাব এবং নূতন কর্মের ও নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—এই সব কারণের সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি।

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বোঝেন কয় জন? যুব-সমিতিকে সেবা-সমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও label বদলাইয়া যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে না। প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে—বিশিষ্ট কর্মপ্রণালী আছে; সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার দরুণ যাহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পাণ্ডা সাজেন তাঁহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনও সেবা বা উন্নতি হইবে না। এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাহারা স্থির থাকিতে না পারার দরুণ যুব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাঁহাদের দ্বারাও কোনও বড় কাজ হইবে না।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বাঙ্গলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁটি কর্মী আছেন—যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কাম ভাবে এই কর্মে যোগদান করিয়াছেন? অবশ্য যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় একটি কথা বার বার বলা প্রয়োজন। সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেবা-সমিতির শাখা-বিশেষ নয়। যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতনের সন্ধান আনা;

নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা; মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া। এই আকাঙ্ক্ষা যার মধ্যে জাগিয়াছে, যে ব্যক্তি নূতনের জন্য, মহত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে—সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া পারে না। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে—যে ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগুন্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে—সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব-সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে।

পূর্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব-আন্দোলন কোনও দিন জন্মিত না। কিন্তু দৃষ্টির সংকীর্ণতার দরুণই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের দরুণই হউক—তাহা হয় নাই। তরুণ প্রাণ বহুদিন যাবৎ অপরের স্কন্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সব ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখিব ফলাফল কি হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল যে কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না ("নহি কল্যাণ-কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি") এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, ভরসা করিয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনও অশুভ হইবে না; জয়লাভ করিলে সে বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে এবং জয়ের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গ-রাজ্যে স্থান পাইবে—(হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং)।

যুব-আন্দোলন—যুবক-যুবতীদেরই আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, মনুষ্য-সমাজকে, মনুষ্য-সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করিতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। প্রকৃতির বুকে যেরূপ evergreen পাদপ পাওয়া যায়—মানুষের প্রাণকেও তদ্রূপ নিত্য সবুজ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্ধক্যের বিরুদ্ধে অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমি গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম—The voice of Krishna was the voice of immortal Youth—গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী।

যাঁহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগর পারের সামগ্রী—তার জন্ম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তার জন্মদাতা জার্মানীর Carl Fischer (কার্ল ফিসার) তাহারা কিছুই জানেন না। এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যত দিন আছে—যুব-আন্দোলনও ততদিন আছে। তবে বর্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নূতন হইলেও বহু পুরাতন; যুগে যুগে এই আদর্শ-বাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নূতন শক্তি দান করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আমাদের এই দেশে মানুষ "ধর্ম-রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন চাইত—তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া "ধর্ম-রাজ্য" স্থাপন করিতে। প্রাচীন কালে গ্রীস্ দেশে সেখানকার ঋষিরা স্বপ্ন দেখিত—Ideal Republic-এর আদর্শ, প্রজাতন্ত্রমূলক সমাজের। তারপর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মনীষী কত Utopia-র স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন New Age-এর (নূতন

যুগের) কথা—কেহ লিখিতেছেন Great Society (বৃহত্তর সমাজের) কথা—কেহ লিখিতেছেন Millenium-এর কথা—কেহ লিখিতেছেন অনাগত সত্য যুগের কথা—কেহ লিখিতেছেন Socialist State (সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের) কথা। নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের পর যুগ একটা আদর্শ-সমাজের এবং আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, আমরা Superman (অতিমানুষ)-এর কথা শুনিতে পাই। Superman-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়—কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান্ সত্য নিহিত আছে। Superman-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক Nietsche (নীট্‌স) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মানুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ Superman-এর (অতিমানুষের) স্বপ্ন দেখেন না—সে জাতির কি Idealism বা আদর্শবাদ আছে? এবং জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত—সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে?

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়—তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়—তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফুরণ যদি ঘটাইতে হয়—তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই। খ্রীস্টীয়দের "বাইবেল"-এ (Bible) একটা কথা আছে—men do not live by bread alone—শুধু উদর পূরণের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তার জীবনধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য—সে কেন বাঁচিয়া আছে—তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে। এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমত না পায়—তাহা হইলে সে জীবনের শক্তি পায় না—নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে—এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। অনুভূতি ও আস্বাদ নিজে যে পায় নাই—সে অপরকে তাহা কি করিয়া দিবে?

স্বপ্ন অনেকের ছিল, অনেকের আছে। আমাদের স্বর্গীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শক্তির উৎস; তাঁর আনন্দের নির্ঝর। তাঁর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে; এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলাফেরা করি, লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি? আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ-মুক্তিসম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না—যে সমাজে জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না—যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমান ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকিবে এবং অলসের ও নিষ্কর্মার কোনও স্থান থাকিবে না; যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন

করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে—আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট নিত্য এবং অখণ্ড সত্য; এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু করা যায়; সর্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করা যায়; সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান।" হে তরুণ—ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমাদের দিবার মত সম্পদ আমার কিছু নাই—আছে শুধু এই স্বপ্ন—যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহার-স্বরূপ দিতেছি—গ্রহণ কর।

আজকাল রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক মজার সমালোচনা শুনিতে পাই—তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা নাকি "যুব-সমিতি"গুলি Capture বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনও প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে—তাহাদের বিরুদ্ধে Capture অভিযোগ হাস্যাস্পদ বটে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র আন্দোলনের এই নবাগত বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন? যাহারা গোড়া হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা আজ Capture অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন Capture করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী! গত কলিকাতা কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করি। সে বিস্তৃত কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল—"To assist students' movement, youth movement and physical culture movement"—অর্থাৎ "ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে হইবে।" এই কর্মপদ্ধতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তখন কোনও আপত্তি শোনা যায় নাই; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে যখন দলের স্বার্থপোষণের জন্য অপরকে গালাগাল দেওয়া দরকার হইল, তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমরা নাকি যুব-সমিতি-গুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি! আমাদের যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে, আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করি নাই। ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা দিন দিন নিষ্কর্মা হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সমিতিগুলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে কিন্তু যাঁহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন—সেই নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্তৃপক্ষরা—এ কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা (propaganda) করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি করিয়াছেন? কোনও কোনও প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব কর্মঠ ও উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যুব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিরোধী।

আর একপ্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই—আমরা নাকি অপরকে কাজ করিবার সুযোগ দিই না। কাজ করিবার সুযোগ কে কাকে দেয়? আমাদেরই বা

কাজ করিবার সুযোগ কে দিয়াছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে নিজ শক্তিবলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লয়; মাতা যেরূপ শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন তার জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিতে হয় না। কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে, আমরা কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছি না—আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে না। যে ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, সে কাজ করিবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না—সে কস্মিন্ কালেও তাহা পাইবে না। এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্মক্ষেত্রের অভাব কোনও দিন হয় না। বাঙ্গলার যুব-আন্দোলনের কর্ণধাররূপে যাঁহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারাও কি কাজ করিবার সুযোগ, সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই?

বাঙ্গলা দেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াছে। বর্তমান দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুগিয়া থাকি আমরা, কারণ সহানুভূতির জন্য, অর্থ সাহায্যের জন্য, আমাদের বার বার জনসাধারণের দ্বারস্থ হইতে হয়। ঝগড়া বিবাদ থাকিলে আমরা সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই না—অর্থ তো পাই-ই না—পাই শুধু অনাবিল গালাগালি। বিবাদ কলহ যতদিন চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ থাকিবে—একথা অত্যুক্তি নয়। সুতরাং বিবাদ মিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া করা এবং কাজকর্ম ফেলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাঁধিয়াছি ঝগড়া করিতে। কংগ্রেস এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস Social Service League-এর নামান্তর নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকা অনিবার্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক সময়ে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতান্তর অনেক সময়ে মনান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপর যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না করিয়া কাহারও উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়—ঝগড়া বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী নয়—তাহাদের অনর্থক বদ্‌নামের ভাগী করা কাহারও উচিত নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য এবং মতান্তরের জন্য ঝগড়া বিবাদ হওয়াও বোধ হয় তদ্রূপ অনিবার্য। কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগালি যেন আমাদের অস্ত্র না হইয়া দাঁড়ায়—এ বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে, ভোটের পরিবর্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না, তাহা হইলে দেশের দুর্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতায় এক ছাত্র-সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপ ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয়। তার পূর্বে চট্টগ্রামে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান্ সুখেন্দুবিকাশ দত্তের মত চতুর্দশ বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল—তাহা ভুলিবার নয়। এসব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তব্য স্থির করা উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এ সব ব্যাপারে

ধামাচাপা দিয়া কোনও লাভ নাই। সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে, তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা গুণ্ডামির আশ্রয় লয়—তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে, ইহার পরিণাম কি। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অপরের উপর গুণ্ডামি করে তার জানা উচিত যে, একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে, কারণ সব মানুষ সমানভাবে সহিষ্ণু ও অহিংস নয়। তার পর আর একটি কথা তার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না—সুতরাং গুণ্ডামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহানুভূতি ও ভালবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া থাকে।

আজকাল যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয় তার মধ্যে কখনও কখনও কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায়—পথ নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ পায় না—কোন্ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা উচিত। এ সম্পর্কে 'দাদা কোম্পানীর' খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এই কোম্পানীর সভ্য কোনও দিন ছিলাম না—আশা করি কোনও দিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা একদিন এই কোম্পানীর সভ্য ছিলেন তাঁহারা কেন দাদা কোম্পানীর প্রতি এত বিরূপ হইয়াছেন? তাঁদের নিজেদের কোম্পানী এখন Liquidation-এ গেছে অথবা তাঁরা এখন promotion লাভ করিয়া ঠাকুরদাদার সোপানে উঠিয়াছেন ইহাই কি তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে—ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ বাঙ্গলাদেশে নাই। যদি কেহ থাকেও তবে সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়।

কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনও কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮।৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই দলাদলি বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয়গগন কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে; প্রথম ধাক্কা স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল; আমরা অবশ্য তাঁর পার্শ্বে ও পশ্চাতে ছিলাম, ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে যে, মাসিক ৫০,০০০৲ টাকার আয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচ হাজারি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে, চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া করিবেন। দেশছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ দেশবাসীর সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ। তখন আমরা অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহুদূরে; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া আমরা যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ফলে কংগ্রেসের জয় হইল। এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা নিজেরা সামনা-সামনি ভাবে খাইতেছি। ফল যে পূর্ববৎ হইবে এবং কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় যে, বিরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগালি আমাদের খাইতেই হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে। এই বিরোধের মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট পাইতাম না।

আর একটা তীব্র সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে—সেটা এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কি করিল? আমাদের দেশে যাঁহারা political minded—যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে—তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন করেন না। এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন যে, দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য—হাসপাতাল নির্মাণ করা, সেবা সমিতি গঠন করা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা। তাঁহারা হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০৲ টাকাও সানন্দে দিবেন না। তাঁহারা বলেন অমুক হাসপাতালের এতগুলি bed হইয়াছে. এতগুলি রোগীর চিকিৎসার আয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে? এরূপ প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (—যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে অন্য কোনও রোগ নির্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধি নিরাকরণ করা? আমাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে পর্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ, সবল ও কর্মঠ জাতি হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম, সম্পদ ও সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমরা শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনও মাপ-কাঠির দ্বারা অপরকে বুঝান যায় না। হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝান যায়, রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা সেভাবে বুঝানো যায় না—তাই বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা, স্বরাজীরা, কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং বাজে কাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরও সঞ্চারিত না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না—রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগিলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা বুঝিবেন না—রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং সর্বস্ব পণ করিতে না পারিলে জাতি কোনও দিন স্বাধীন হইবে না।

তাই আমার অনেক সময় মনে হয় যে, আমাদের দেশবাসীর মধ্যে political mentality-র বড়ই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায় সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে—তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—আত্মবিকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে, জাতি সেদিন মুক্ত হইবে।

জনৈক বন্ধু আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—গত দুই বৎসর ধরিয়া আপনি কি করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটু তুলনা করা দরকার গত দুই বৎসরের আগের দুই বৎসর কি হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কি কাজ হইয়াছে। গত দুই বৎসর বেশী কাজ হউক আর না হউক—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে তবে বাঙ্গলায় ও পঞ্জাবে। এবং গত দুই বৎসর বাঙ্গলাদেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ বাঙ্গালী সরকার

বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তথাপি এ কথা কৈফিয়ত স্বরূপ আমি বলিতে চাই না যে, আমরা গত দুই বৎসর যাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্হ। আমি শুধু বলিতে চাই এই কথা যে, যে-অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ছিল ভাঙ্গা-হাটের মত। একে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে—তার উপর আবার বাঙ্গলা দেশে ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের বহু কর্মী তখনও কারারুদ্ধ। এই দুর্যোগের মধ্যে আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি।

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে একদিকে তাহাকে জোড়াতালি দিয়া পুরান প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। যে প্রোগ্রাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি, সে প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা নূতন প্রোগ্রাম চাই—কিন্তু নূতন প্রোগ্রাম চাইবার পূর্বে চাই নূতন মানুষ—যাহারা নূতন প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখনকার কংগ্রেসে যদি আপনি নূতন প্রোগ্রাম লইয়া যান—কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না—গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে লাগাইবে না—অর্থাৎ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা "প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম" বলিয়া কেবল চীৎকার করেন কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ার না করিলে সে প্রোগ্রামের মূল্য বুঝিবে কে?

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে—কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনও আসে নাই—আসিবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে, যাহারা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ারী করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিরত। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বলিয়া আসিয়াছি। এই সব আন্দোলনের সাহায্যে যদি নূতন মানুষ—পুরুষ ও নারী—প্রস্তুত হয়, তখন নূতন প্রোগ্রাম দিলে তার সার্থকতা হইবে।

এই সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। আমার আদর্শ—দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলব্ধি করি নাই। অখণ্ড রূপের উপলব্ধি জাতির মানসক্ষেত্রে এক দিনে আসে না। বহু দিনের সাধনার ফলে এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ড-রূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ কি। যে দিন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করিবে সেই দিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতিভেদের অচল

আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে; নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজ-তন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাংগীণ স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বলিয়া জগৎ-সভায় পরিগণিত হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে—ধর্মে কর্মে—শিক্ষায় দীক্ষায়—শৌর্যে বীর্যে জগৎ-বরেণ্য হইবে।

আমাদের কর্তব্য কি তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙ্গালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না দশভুজারূপী দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ! আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই!

[বিগত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯, মেদিনীপুর যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ চার ॥

"মনে রাখিবেন আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে-প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এই সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে?"

হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল! আপনারা আমাকে এই তরুণ পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি।

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারা-প্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্বপ্রথম এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্দৈববশতঃ আমরা যেন আপাততঃ বড় কথা ভাবিবার এবং দূরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের প্রতি দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে সত্য মনে করিয়া, আসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সাময়িক মোহ ভাঙ্গিতেছে; আমরা আমাদের সহজ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্ম-প্রত্যয় জন্মিতেছে। সে বুঝিতেছে—জীবনে তাহার উপর কত বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে; সে উপলব্ধি করিতেছে যে, ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ-সমাজ আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইতেছে! সর্বদেশে সর্বকালে যে মৃত্যুঞ্জয় তরুণ-শক্তি মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণ-শক্তিই নিজের অস্থিদান করিয়া বজ্র নির্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটি অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই আমি সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুত্থান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইয়াছে। আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম। ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে—ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কালের চক্রবৎ পরিবর্তনের সংগে সংগে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়,—বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে; আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইতেছি।

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে—এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহ্যিক চাঞ্চল্যমাত্র নয়,—ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও অভিব্যক্তি। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে—নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে—তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা জাগিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার নূতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোনও সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে থাকে, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে adventure ও enterprise-এর স্পৃহা হ্রাস পায়, কতকগুলি বাঁধা বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যে বড় রকমের ওলট-পালটের প্রয়োজন এবং জীব-রাজ্যে (biological plane) রক্ত-সংমিশ্রণ আবশ্যক। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাতির সহিত ভারতবাসীর রক্ত-সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশী হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশংকাই বেশী। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে—যে সব জাতি আছে—তাহাদের মধ্যে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভাল হইতে পারে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় অধঃপতনের অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবিক দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা আমরা কার্যতঃ স্বীকার করিতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা বা initiative-এর অভাবের দরুণ, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাবদৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না—এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মতের ও কর্ম-প্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—Socialism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy, Aristocracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি। এই সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে ২।১টি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর

সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্য দেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

আপনারা জানেন যে Marxism-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চ হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রুশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে, রুশিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে —তার সহিত Marxian Socialism-এর মিল যতটা আছে—পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রুশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রুশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সব কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।

আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে আসল কথাই বলা হইবে না। পরাধীন দেশে যদি কোনও "ism"—সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা nationalism। যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Social and Economic) পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাইব না, এ কথা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত চেষ্টায় স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়—এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক—কোনও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এই জন্য আমি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ-আন্দোলনের পরিপন্থী তো মনে করিই না—বরং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজলাভের আশা দুরাশা মাত্র—এবং তাহারা যে পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলন অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়—গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের

অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় গঠনমূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ তাহাদের ভাবের অভাবের কথা। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভাব-দৈন্যের কারণ কি? কারণ এই যে, যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন করেন না। আমাদের ভাবদৈন্যের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধানতঃ দায়ী করি। আমি জিজ্ঞেস করি—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা ঐ আঙ্গিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাগরণের বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন—ফরাসী দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন—তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন—তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।

ভাবের দৈন্যের পরই অন্নাভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার চেয়েও অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকুরীর দ্বারা যে তাহাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা চাকুরীর সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবার্য যে আগামী ৩০।৪০ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমরা যদি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততির বাঁচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এখনও যদি আমরা চাকুরীর আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তো মরিবই—সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মরণের আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের মাড়োয়ারী ভাইরা ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখানেই দুই দিকে কাজ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা

আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্মী এই League-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাঁহারা "best brain of the entire nation" তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে—তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ যুবকদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পরবিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা। এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সমিতির কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আজ ঐ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় আসিয়াছে। কোনও নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন না করিয়া আপনারা যদি ঐ পুরাতন নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিবে, একথা আমি বিশ্বাস করি।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বিস্তৃত কর্মতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব না। কি আদর্শ লইয়া এবং কি প্রণালীতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু বলিলেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) অন্নাদির অভাব, (২) বস্ত্রাদির অভাব ও (৩) শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ—ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent Despot-এর মত সরকার বাহাদুর অথবা Local Body-রা যদি জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানতঃ নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ফিরিয়া আসিবে এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লী সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লীবাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর-শীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লীসংস্কারের কোনও সার্থকতা হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।

আজকাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমত এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ

করা প্রয়োজন। গবেষণা আরম্ভ করিলে একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি না। কিন্তু তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার। আমি সকল চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম বা লোকাচারের নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় শুধু বিবাহ কেন—আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা যে বাপ-মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন—এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যুবকেরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার ভাই ও ভগিনী সকল, আজিকার মত আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। মনে রাখিবেন যে, আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন—আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে!"

[বিগত ১লা পৌষ ১৩৩৪, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল-গৃহে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।]

॥ পাঁচ ॥

"চিন্তা ও কর্মের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সমস্ত জগৎ হইতে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন—এইরূপ মনে হইবে। সেই সংকট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের বাণী মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারেন।"

মধ্য প্রদেশের যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রিত করিয়া আমাকে যে-সম্মান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এখন সকল যুবকেরই কর্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য মিলিতভাবে পরামর্শ করা। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার বা তজ্জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-প্রদেশের যুবকেরা যে বয়োবৃদ্ধগণের সাহায্যের মুখ না চাহিয়া নিজেরা উৎসাহী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে আমি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত আশাপ্রদ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। যদি আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্যে একটুও সাহায্য করিতে পারি, তবে আমি নিজেকে ধন্য এবং আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

যাঁহারা বর্তমানের এই যুব-আন্দোলনের প্রতি খানিকটা বিরূপ, অথবা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করেন, এদেশে এরূপ কেহ কেহ আছেন—এবং সাধারণের চক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা প্রতিষ্ঠাবান্, যুব-আন্দোলনের গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যোগদান করেন নাই বলিয়া এরূপ কোনও আন্দোলন গড়িয়া উঠা উচিত নয়—সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যুব-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, এরূপ লোকের অভাব নাই!

ভারতবর্ষে আজিকার এই নবজাগরণের প্রথম উন্মেষের সময় হইতেই এক এক করিয়া অনেকগুলি আন্দোলন-প্রচেষ্টা ও ভাবধারার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে যুব-আন্দোলনের রূপ লইয়া অপর একটি আন্দোলনের জন্ম হইবে, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইহার আবির্ভাবের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ব্যক্তি ও জাতির প্রাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার ফলে যুব-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তরের সেই মূলগত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে স্বাধীনতা ও আপনাকে সার্থক করিবার আকাঙ্ক্ষা।

দেশ আজ এমন একটি আন্দোলন চায়, যাহা ব্যক্তি ও জাতিকে সর্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে—তাহার আত্মপ্রকাশ ও সার্থকতার সকল পথই খুলিয়া দিবে। কেহ কেহ হয়তো যুব-আন্দোলনকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা-আন্দোলনে পরিণত

করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও কংগ্রেস এখনও পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই যে সকল তরুণ-তরুণী জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে চাহেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা যে কংগ্রেসের মত শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন না এবং মানব-হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের সকল কামনাকে পূর্ণ করিতে চাহে এমন একটি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাই বুঝা যায়, যুব-আন্দোলন কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন না হইলেও রাজনীতি ছাড়া নয়। ইহার উদ্দেশ্যের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। ইহার সমগ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলিই রহিয়াছে বলিয়া যুব-আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক উন্নতিতেও উৎসাহ দান করিবে।

যুব-আন্দোলন বর্তমানের প্রতি আমাদের অসন্তোষের প্রতীক। যুগসঞ্চিত বন্ধন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ। সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত সৃজনীশক্তিপ্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের ও মানবজাতির জন্য নূতনতর জগতের প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। যুব-আন্দোলন তাই বর্তমান আন্দোলনসমূহের উপরে ন্যস্ত একটা অতিরিক্ত বা বিদেশ হইতে আমদানী করা কর্মধারা নয়—ইহা সত্যকার একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন এবং ইহার মূল উৎস মানব-স্বভাবের গভীরতম অন্তস্তল।

বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট অভাব ও মানুষের প্রাণের উদগ্র বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। ইহার গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে কেবল মাত্র আন্দোলনে যোগদান করিলে বা যুবসংঘে প্রাধান্য স্থাপন করিলে কোন ফললাভ হইবে না। আমার মনে হয়, যুব-আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি না থাকিলে কেবল-মাত্র তরুণ-তরুণীর সংঘ হইলেও কোন প্রতিষ্ঠান যুব-সংঘ পদবাচ্য হইতে পারে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একটা চঞ্চলতা ও বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং নব-সমাজ স্থাপনার প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার বন্ধন-মুক্তি এবং যেখানে আচার ও অবস্থা মানুষের বিবেকের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, সেখানে আচার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—যুব-আন্দোলনের ইহাই লক্ষ্য। তাহাদের মন্ত্র হইতেছে আত্মনির্ভরতা—অন্ধ ভক্তি ও বয়োবৃদ্ধদের অবিচল অনুবর্তিতা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাতে যদি বয়োবৃদ্ধদের কেহ কেহ যুব-আন্দোলনকে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমাদের সমস্ত জীবনের ধারাকে নব নব পথে প্রবাহিত করা এবং নবীন আদর্শের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করাই যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা জীবনের যে পুনর্গঠন করিতে চাই, এই আদর্শই তাহাকে নব অর্থ ও নব প্রেরণা দিবে। এই আদর্শ হইতেছে পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও আপনাকে চারিদিক দিয়া সার্থক করিয়া তোলা। স্বাধীনতা ও জীবনের সার্থকতা নিবিড় ও অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্বন্ধ। স্বাধীনতা না থাকিলে নিজেকে সার্থক করা সম্ভব না। এবং সার্থকতার দিকে জীবনকে লইয়া যায় বলিয়াই স্বাধীনতা এত মূল্যবান।

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। তাই জীবনে যতগুলি দিক আছে, যুব-আন্দোলনেও ততগুলি দিক থাকিবে। শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে

আমাদিগকে ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে; হৃদয়কে মুক্ত ও নবশিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে নূতন সাহিত্য, উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজকে নবজীবন দান করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দয়ভাবে বাঁধা আচারব্যবস্থা ও ভাবধারা দূর করিয়া নূতন ও বলীয়ান্ সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাবসমূহের প্রবর্তন করিতে হইবে। আরও যুগোচিত আদর্শের আলোকে আমাদিগকে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে—এবং সম্ভবতঃ, আমাদিগকে এরূপ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অবতারণা করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যতের পথও নিয়ন্ত্রিত করিবে।

চিন্তা ও কর্মের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব, এবং সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগকে মনে হইবে। সে সংকট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের কথা মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"জগৎকে যেমন একজন (খৃস্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারে।" যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্যানুযায়ী যে মুহূর্তেই আপনারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শকে প্রতিফলিত করিবেন, সেই মুহূর্তেই চারিদিকে শত্রুর আবির্ভাব হইবে এবং সকল স্বার্থবান্ ব্যক্তিই আপনাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হইবে। একদিক হইতে দুর্ধর্ষ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা সহজ—কিন্তু একযোগে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যুব-আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের তাই কঠিন শত্রুর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, সেজন্যে আমাদিগকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলনে জন-সাধারণের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাহাদের ভাব ও চিন্তার সহিত সহানুভূতি জানানো অনেক সময়ে প্রয়োজন, কিন্তু যুব-আন্দোলনে যোগ দিতে হইলে আপনাদিগকে জনপ্রিয় হইবার লোভ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কখনও কখনও জনমত গঠন করার বা জনসাধারণের মনের উচ্ছ্বাস দমন করার দায়িত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে। যদি আপনারা জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চাহেন, তবে আপনাদের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চেয়ে দৃষ্টিকে বহুদূর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে। জনসাধারণের চিন্তা বর্তমানের বন্ধন কাটিয়া ভবিষ্যতের রূপটিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। দেশের ভবিষ্যতের অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া যদি তাহার প্রতিবিধান করিতে আপনারা চাহেন, তবে জনসাধারণ যে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিবে না, তাহা অসম্ভব নহে। তখন বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারার মত সাহস আপনাদের মনে জাগরূক হওয়া চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায়, সে হয়ত সাময়িক ভাবে সাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়—কিন্তু ইতিহাসে সে অমর হইতে পারে না, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সৃষ্টি করিতে পারে না। জাতির ইতিহাস গঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে বহু বিরুদ্ধবাদ ও অত্যাচার সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্যও নিন্দা ও বিদ্রূপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও

শত্রুতা লাভ—ইহাতে আশ্চর্য হইলে চলিবে না।

কিন্তু মানব স্বভাবে একটা অন্তর্নিহিত দেবত্ব আছে, তাই ভুল উপলব্ধি, নিন্দা ও অত্যাচারের দীর্ঘ দিনও একদিন শেষ হয়। গভীরতম বিশ্বাসের জন্য মরিতে হইলেও সে মৃত্যু আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে। তাই যে কোন অবস্থার জন্যই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আঘাত বিপদ আছে বলিয়াই ত' জীবনের মূল্য আছে —ত্যাগ, শোক ও অত্যাচার না থাকিলে জীবনের কি কোন সৌন্দর্য, কোন বিচিত্রতা থাকিত?

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শরীরগত এবং শিক্ষা-দীক্ষাগত—যুব-আন্দোলনের এই পাঁচটি দিক্ আছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিধাবিভক্ত—উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা এবং এই মুক্তিলাভ করিয়া আপনাকে সার্থক করিবার ও প্রকাশ করিবার পথে নিজেকে উদ্দীপিত করা। সুতরাং ইহা একাধারে ধ্বংস ও গঠন মূলক। একদিক হইতে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আর একদিক হইতে গঠন করা যায় না। সেইজন্যই দেখিতে পাই, প্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গাগড়া পাশাপাশি চলিতেছে। ধ্বংস ভাল নয়, গঠনই ভালো এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন করা সম্ভব—একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার, ধ্বংসেই ধ্বংসের লক্ষ্য, একথা মনে করাও ভুল হইবে। জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিলেই অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, অনেক সময়ে হয়ত নির্দয়ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। অসত্য, কপটতা, বন্ধন ও সাম্যের অভাবকে কোন মতেই মানিয়া চলা যায় না। এই সমস্ত বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। যখন আমাদের কর্তব্য শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের দিকে মুখ চাহিয়া পিছনে পড়িলে চলিবে না।

ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কারমূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়—জীবনের রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত রূপান্তরই চাই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক—উভয় জীবনকেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্দীপিত করিবার জন্য স্বাধীনতার একটা নূতনতর ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণাটি ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে—সকল প্রকার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। অন্ততঃ এই অর্থটিই যুবকদের মনে ভালো লাগিয়াছে। অর্ধপথে গিয়া থামিয়া থাকা আর আমাদের ভালো লাগে না—আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। আমরা যদি স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে ভালবাসি তবে বন্ধন বা বৈষম্যকে আমরা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। রাজনৈতিক হউক, অর্থনৈতিকই হউক বা সামাজিকই হউক—সকলের উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নীতিটাকে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে—ইহাই হইবে আমাদের কথা। এই নীতিটিকে মুখে বলা সহজ কিন্তু ইহাকে অনুসরণ করা দুরূহ।

বন্ধুগণ, যাঁহারা যুব-আন্দোলনের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে চাহেন তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া আমি অকারণ আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। এই আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলেই

আমার কার্য শেষ হইল। আমাদের আদর্শ অত্যন্ত সুদূরস্পর্শী—হয়ত ইহার চেয়ে দুরূহ আদর্শ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। আমরা আমাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিতে চাই—নিজেদের ও সমস্ত মানব জাতির জন্য নূতন উজ্জ্বলতর জগৎ সৃষ্টি করিতে চাই। একমাত্র স্বাধীনতার মোহন স্পর্শই আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিরত কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে পারে। কেমন করিয়া আমাদের এবং দেশবাসীর মনে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারি, সেই হইতেছে আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সমস্যা। আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে দাসত্বের বেদনা ও বন্ধনের দুঃখটিকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভূতি যখন তীব্র হইবে, তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, স্বাধীনতাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়িয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল প্রাণ স্বাধীনতা-তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

মনের এই অবস্থায়ই আমরা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রচারক হইতে পারি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত নরনারী আমরা, তখন গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে গিয়া স্বাধীনতার এই নূতন বাণী প্রচার করিতে পারিব। এই প্রচারকার্যের ফলে তখন জীবনের সকল পথেই নবজীবনের স্পন্দন আসিবে। একদিক দিয়া ভাঙ্গা, অপর দিক দিয়া গঠন আরম্ভ হইবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সকলেরই ক্ষেত্র তখন এক নূতন প্রেরণায় উদ্বেল হইয়া উঠিবে—সে প্রেরণা স্বাধীনতার ও সাম্যের। পথনিরোধকারী আচার, যুগসঞ্চিত বাধা, জীবনের সকল মিথ্যা মাপকাঠি সেদিন চূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া নবসৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিবে। আমরা যদি মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নব-সমাজের সৃষ্টি করিতে পারি তবে শুধুমাত্র যে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহা নয়—জগতের এক বিপুল সমস্যার সমাধানও করা হইবে।

ভারতবর্ষ একটি ছোটখাটো পৃথিবী—জগতের সকল সমস্যাই ভারতবর্ষে বর্তমান আছে। তাই ভারতের সমস্যা সমাধানের অর্থই জগতের সমস্যার নিরাকরণ। অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ, তাহার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে, তাই তাহার মুক্তিলাভের প্রয়োজন আছে। জগৎ আজ ভারতের দানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া আছে—তাহা না পাইলে জগৎ দীনতর থাকিবে।

বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব অতি কঠিন। প্রতি যুগে, প্রতি দেশে যৌবনই মুক্তির আলোক-বর্তিকাটিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। বিদেশী যুবাদের দৃষ্টান্তে আজ আমাদেরও জীবন যাপন করিতে হইবে। আমরা যদি আজ উঠিয়া দাঁড়াই তবে তাহারা যে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমরাও তাহা পারিব। আমরা এক পরিবর্তনসঙ্কুল যুগের মধ্যে বাঁচিয়া আছি—আজ ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি ভারতের যৌবনের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা তাঁহাদের এই মহান্ দায়িত্ব-ভার উপলব্ধি করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের দুঃখ স্বীকার এবং তাঁহাদের কর্মের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হইবে—যে ভারতে মুক্ত নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ লাভ করিবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। একমাত্র কথা এই,

কবে ভারত স্বাধীন হইবে? আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব, দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব, আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে না পারি, তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি।...স্বাধীনতার পথ কন্টকময় পথ—কিন্তু ইহা অমরত্বের পথও বটে। মধ্যপ্রদেশের ভাই ভগিনীগণ, এই পথে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বন্দে মাতরম্।

[গত ২৯শে নবেম্বর ১৯২৯ তারিখে মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।]